সুকুমার দে সরকার

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির

৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ

মহালয়া ১৩৫৮

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

ভাদ্র ১৩৬৪

সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

প্রকাশ করেছেন

অমিয়কুমার চক্রবর্তী

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির

৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলকাতা-১২

ছেপেছেন

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ

মা মঙ্গলচণ্ডী প্রেস

১৪/বি শঙ্কর ঘোষ লেন

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ এঁকেছেন

শৈল চক্রবর্তী

বনের পশু-পাখিরা কি কথা বলে? আমরা সঠিক জানি না। কোন একটা শব্দ করে তারা ভাবের বিনিময় করে নিশ্চয়। কিন্তু গল্পে প্রায়ই দেখা যায় যে পশু-পাখিদের দিয়ে বেশ মানুষের ভাষায় কথা বলিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অনেক আছে নিছক রূপকথা, অনেক উপদেশের গল্প যেমন বিষ্ণুশর্মার গল্প, অনেক জ্ঞানের কথা যেমন ঈশপের গল্প। আবার কিপলিং-এর গল্পে বা ধনগোপাল মুখুজ্জে মশায়ের গল্পে, এমনকি আমার মনে হয় আমার নিজের গল্পেও পশু-পাখিরা যে কথা বলে তাতে মনে হয় যে যদি পশু-পাখিরা কথা বলত হয়ত এইরকমই বলত। তোমরা কেউ কেউ কোনদিন হয়ত পাখি বা খরগোস বা কুকুর পুষেছ। সেই তোমাদের প্রিয় পোষা জীবগুলির চোখের দিকে তাকিয়ে তোমাদের কোনদিন কি মনে হয়নি যে ওরা কি-যেন বলছে, আর সেই বলা কি মানুষের ভাষায় তোমাদের কানে গম-গম করে ওঠেনি?

আমার ভারতের কী বিচিত্র রূপ! কোথাও আদিম, কোথাও আমাদের বহু প্রাচীন সভ্যতার বয়ে-আনা সভ্যতর জীবন। কোথাও পাহাড় উত্তুঙ্গ, বিশাল; কোথাও সমুদ্র ঊর্মিময়, উত্তাল। কোথাও সহর, গ্রাম; কোথাও বন। এই সবের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে জীবনের একটা অনন্ত স্রোত। এখানে আছি আমরা আর কত বোবা জীব! আমি লিখি আমাদের এই দেশের বিচিত্র রূপ নিয়ে আর ওই বোবা জীবদের নিয়ে। ছেলেবেলা থেকেই বন্য জীবের প্রাকৃতিক জীবন আমার কাছে ছিল বড় বিস্ময়ের! ছেলেবেলা থেকেই তাই নিয়ে পড়েছি অনেক—দেশী ও বিদেশী কাহিনী ও জীবনী। তারপরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার অনেক সময় কেটেছে অনেক বনের পথে-পথে, পাহাড়ের কোলে ও চূড়ায়। বন্য জীবন দেখেছি কিছু, তার সঙ্গে মিশেছে

কল্পনা আর ছেলেবেলায় পড়া বিস্মৃতপ্রায় দেশী ও বিদেশী কাহিনীর আবছা-আবছা টুকরো ছবির ছায়া।

'ময়ূরকণ্ঠী বন' একটা সম্পূর্ণ উপন্যাস, আমার দেশের অনেক বনের সমষ্টির পটভূমিকায়। এর কাহিনী সম্পূর্ণ মৌলিক—কোন বিদেশী কাহিনীর ছায়া নিয়ে নয়। তবু এর কোন ছবি যদি কারও মনে কোন পুরোনো ছবি চমকে দিয়ে যায়, বন্যজীবনের প্রতি একই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সেইসব চিত্রকরদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাবো।

সুকুমার দে সরকার

পার্থকে—

এক

ময়ূরকণ্ঠী বনের উত্তর-পুব সীমানায় বিস্তৃত জলাটার মাথায় সূর্য উঠল। জলার নীল জলে এক দিকে তরুণ সূর্যের প্রতিফলিত সোনা, বাকি বুক জুড়ে দীর্ঘ বনঝাউগুলোর ছায়া মৃদু বাতাসে সর্পিল হয়ে কাঁপছে। দক্ষিণে যতদূর চোখ যায় বনশীর্ষ ধোঁয়াটে নীল, তারও ওপারে আকাশের তামাটে নীল পটে আঁকা পাহাড়ের দল যেন প্রথম বর্ষার মেঘের মত থমথমে, কৃষ্ণাভ, গম্ভীর।

জলাটা ঘিরে কতরকমের গাছ! বনঝাউয়ের দল উপুড়-হয়ে-পড়া আকাশটাকে মাথায় নিয়ে ছাতার মত ছড়িয়ে ঘন-নিবিড়, নিবিড়তর হতে হতে দিগন্তে বিছিয়ে গেছে। জলার ধারের ঝাউগুলোকে জড়িয়ে উঠে কয়েকটা বুনো লতা আকাশে আঙুল বাড়িয়ে যেন একবার তাকে পরখ করে নিতে চায়। লতাগুলোর গা বেয়ে বনসীমের মত লম্বা লম্বা সবুজ ফল ঝুলে আছে। ঘাসের ওপর কুচো কুচো হলদে বুনো ফুল ফুটে আছে যেন তারার মত, রোদ উঠলেই চোখ বুজোবে তারা। বুনো নিমফুলের গন্ধে বাতাস ভরপুর।

একটা পাহাড়ে নালা দক্ষিণের বন থেকে এঁকেবেঁকে বেরিয়ে এসে জলায় পড়েছে। বর্ষায় ওটা ফুলে ওঠে, কিন্তু এখন শুধু বড় বড় বুনো ঘাসে ঢাকা। পাড়ের স্যাঁৎসেতে ভিজে মাটিতে ফুটে আছে নানারকম ব্যাঙের ছাতা। ওই নালাটাই বাঘ-ডহর, বা বাঘের চলাফেরার পথ। দীর্ঘ ঘাসের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে সুচতুর প্যান্থার

ওই নালা-পথে জলায় এগিয়ে আসে শিকারের লোভে লোভে। ঘাসের ডগাগুলোয় শুধু একটু সুইস্ সুইস্ করে শব্দ হয়, মনে হয় বাতাসে কাঁপছে।

জলাটা পাখিদের স্বাভাবিক আড্ডা। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পাখিদের কলরবে মুখরিত হয়ে ওঠে জলা। কত রকমের পাখি! সবুজ বিদ্যুৎ হেনে বনটিয়ার ঝাঁক লতার ডগায় বসে দোলে। শালিক আর শ্যামার শীষে বসন্তের নেশা। থেকে থেকে কটকটে ডাক ডেকে ওঠে হরটিটের দল। উঁচু গাছের মাথায় বাজকৌড়ি, চিল আর কুল্লো জলচর পাখিদের ঝুটোপুটির দিকে শিথিল অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ঘন নিবিড় পাতার আড়াল থেকে মানিক পাখির গম্ভীর ডাক যেন এইসব গোলমালের ওপর বিরক্তি জানায়।

জলার নীল জলে তখন ডাহুক আর কাঁকের দল মহা ঝুটোপুটি লাগিয়েছে। তাদের ডানার ঝাপটে সেখানকার জল আলোড়িত। এবার বসন্তে একটা বড় লাল হাঁসের ঝাঁক নেমেছে জলায়। ময়ূরপঙ্খী সার দিয়ে একটার পর একটা ভেসে চলেছে তারা, পেছনে তাদের জল শির-শির করে কাঁপছে। দূরে একটা বড় গাছের মাথায় একঝাঁক সাদা বক যেন সাদা ফুলের তোড়ার মত ফুটে আছে।

বসন্তের এই সময়টা জলার ধারের বনটায় কয়েকরকম বুনো ফল পাকে যা হরিণদের বড় প্রিয়। ঝিকমিক তাই তার সম্বর হরিণের দলটা চালিয়ে নিয়ে এদিকে এসেছে। তার দলে কয়েকটা হরিণী, কতগুলো বাচ্ছা আর সে। ঝিকমিক একটা বড় শিঙাল পুরুষ-হরিণ। জোরালো কাঁধ বেয়ে তার মোটা মোটা পাটকিলে লোম ঝুলে পড়েছে। মাথার শিং জোড়া তার কতগুলো বসন্তের চিহ্ন নিয়ে ডালে-পালায় লতিয়ে ছুঁচাল হয়ে গেছে। ঘাড়ের একদিকে তার একটা বাঘের থাবার দাগ সুস্পষ্ট। শিঙাল পুরুষ-সম্বররা সাবধানী হলেও ভীতু নয়। দলকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে তারা লড়তে ভয়

পায় না। একটা গাছের নিচে বসে ঝিকমিক শান্ত মনে তলায়-ঝরে-পড়া পাকা ফল চিবোচ্ছিল। হরিণীর দল এদিক-ওদিক চরে চরে খাদ্য সংগ্রহ করছে। বাচ্ছাগুলো তাদের মায়েদের পেটের তলা দিয়ে আনাগোনায় ব্যস্ত। দলের দুটো বাচ্ছা বেশ বড় হয়ে উঠেছে। দুটোই পুরুষ, তাদের মাথার শিংগুলোয় ঝিকমিকের মত প্রাচুর্য না এলেও যৌবনের ঔদ্ধত্যের ছোঁয়া লেগেছিল। তাদের দিকেই তাকিয়ে ছিল ঝিকমিক। তারা তখন তাল ঠুকে শিঙে শিং লাগিয়ে বল-পরীক্ষায় ব্যস্ত। একটার রং পাঁশুটে, আর-একটার রঙে হলদের ছোঁয়াই বেশি। পাঁশুটে হরিণটাকে আমরা বলব মৃগ আর হলদেটাকে উচ্চৈঃশ্রবা। দুজনেই আকারে এবং বয়সে প্রায় সমান, তাই বোধহয় রেষারেষি ; এখনও খোলা ঝগড়া হবার বয়সে তারা আসেনি। এক-একবার তাল ঠুকে তারা পেছিয়ে যাচ্ছিল, আবার তেড়ে শিঙে শিং লাগিয়ে চাড় দিচ্ছিল—কে কাকে ফেলতে পারে।

আকাশের রং প্রখর হয়ে এল। কালো বিন্দুর মত চিলেরা উঠেছে আকাশে। জলায় পাখিদের কলরব ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছে। পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে গেল খাবারের সন্ধানে। দুটো ছাতারে পাখি লাফাতে লাফাতে নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে ঝিকমিকের দিকে। ঝিকমিক শিথিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওই যুদ্ধে ব্যস্ত হরিণদুটোর দিকে। লেজটা তার সপ্‌ করে একবার শরীরের ওপর দিয়ে ঘুরে গেল। কতগুলো বসন্ত আজ? ওই মৃগ আর উচ্চৈঃশ্রবাকে সে একটু একটু করে বনের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা শিখিয়েছে। বাঘের পায়ের আওয়াজ, ভাল্লুকের শাঁখের মত ক্রুদ্ধ গম্ভীর গর্জন, অহিরাজ শঙ্খচূড়দের দুর্বার, চকিত হিস্‌ হিস্‌ শব্দ, হাতীর দলের গম্ভীর বৃংহিত আর ভয়ঙ্কর করগড়ির দলের আক্রমণের ডাক। বনে হরিণদের শত্রুর অভাব নেই, তবু এই বন তাদের আবাস, নিজস্ব আশ্রয়।

খট্ খট্। শিঙের কয়েকটা চাকলা ভেঙে ছিটকে পড়ল।

মৃগ প্রচণ্ড একটা ঢুঁ লাগিয়েছে আর উচ্চৈঃশ্রবা তার শিঙে শিং বাধিয়ে দিয়ে দুরন্ত চাড় দিচ্ছে। চোখ দুটো তার ক্রুদ্ধ, লাল। কাঁধের পেশীগুলো উঠেছে ফুলে।

মৃদু একটা শব্দ করে ডেকে উঠল ঝিকমিক। হরিণীর দল মুখ তুলে চমকে তাকালো, কিন্তু উচ্চৈঃশ্রবা আর মৃগ তখন উত্তেজিত। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো ঝিকমিক। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদের একটা টুকরো তার কাঁধের পাটকিলে সোনালি লোমের ওপর পড়ে ঝকঝকিয়ে তুলেছে। আবার একটা আস্তে ডাক, তারপর হঠাৎ সে ওই বাচ্ছাদুটোর শিঙের মাঝখানে গিয়ে দমকা একটা ঢুঁ মারল। দুপাশে দুজনে ছিটকে গেল, মৃগ আর উচ্চৈঃশ্রবা। ঝিকমিক তখন বাতাসে মুখ তুলে ঘ্রাণ নিচ্ছে। কিসের গন্ধ না? কি একটা দল এদিকে আসছে? বন্ধু, না শত্রু? আবার মৃদু অদ্ভুত একটা শব্দ করে উঠল ঝিকমিক। হরিণীর দল তখন খাওয়া ছেড়ে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে একটা হরিণী, তারপর কয়েকটা বাচ্ছা, তারপর ঝিকমিক, তারপরে দল। হরিণদের চলার নিয়ম ওই; দলের আগে দলপতি থাকে না। একটা হরিণী পথ চালিয়ে চলে। শিঙাল পুরুষ-হরিণ একটু পেছনে থেকে আগলে চলে। শুধু দল আক্রান্ত হলে এগিয়ে আসে দলপতি।

ঝিকমিকের দল নিঃশব্দে গাছের আড়ালে আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে চলতে শুরু করল।

সম্বরের দলটা চলে যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই শান্ত বনে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল। প্রথমে শোনা গেল একটা ক্রুদ্ধ ফোঁসফোঁসানি, তারপর গর্জন গাছটায় প্রচণ্ড একটা ধাক্কা মেরে ডুমুরের ডালগুলো ভাঙতে ভাঙতে উর্ধ্বশ্বাসে জলায় এসে নামল একটা দাঁতাল হাতী। এই একটা হাতীকেই একটা দল বলে ভুল হবার কারণ ছিল

ঝিকমিকের। হাতীটা একটা দুষ্টু হাতী। দাঁতাল পুরুষ-হাতীদের দুষ্টু হয়ে যাওয়ার একটা ইতিহাস আছে। হাতীদের দলে সাধারণত যূথপতি থাকে একজন। নবযৌবন-পাওয়া সঙ্গীহারা কোন হাতী বনে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা হাতীর দলের দেখা পেলে দলপতিত্ব চেয়ে বসে। এখন, দলের যূথপতি যে সে তার অধিকার ছেড়ে দেবে কেন? লেগে যায় ভীষণ যুদ্ধ। হস্তিনীর দল পিছন ফিরে আড়চোখে নির্বিকারে দেখতে থাকে সেই যুদ্ধ। বন আলোড়িত হয়ে ওঠে। আগের দলপতি যদি হেরে যায়, নতুন বিজেতাকে বরণ করে নেয় হাতীর দল, আর সেই আগের দলপতি—তার আর স্থান থাকেনা দলে। সে তখন যূথভ্রষ্ট। অন্য কোন দলও তাকে জায়গা দেয় না, যদি না সে সেই দলের দলপতিকে হারিয়ে জায়গা করে নিতে পারে। কিন্তু সাধারণত এই মার-খাওয়া হাতী বহুদিন পর্যন্ত তার মনের বল ফিরে পায় না। এই সময় এই নিঃসঙ্গ হাতী দুষ্টু হয়ে ওঠে। এই সময় তার হত্যার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে, যে-কোনো নিঃসঙ্গ প্রাণী দেখলে অকারণ রাগে ফুলতে ফুলতে সে তেড়ে যায়। তাড়া-খাওয়া জানোয়ার পালাতে পারল তো ভালই, নাহলে সেখানেই তার শেষ।

এই দুষ্টু হাতীটার আক্রোশে বন দলে চলার আওয়াজকেই একটা দল বলে ভুল করেছিল ঝিকমিক। হাতীটা জলার ধারে এসে থমকে দাঁড়ালো একবার, আকাশে শুঁড় তুলে গর্জন ছাড়ল একটা। চোখ-দুটো তার রাগী, লাল, কানদুটো পতপত করে দুলছে। লাল হাঁসের দল জল ছেড়ে সার বেঁধে আকাশে উঠল—পৈঁয়াক্, পৈঁয়াক্!

লিলিফুলের সুবাসে বিস্তৃত জলা ভরপুর।

সেই স্বচ্ছ, নিস্পন্দ জলা তোলপাড় করে হাতীটা নামল জলে। শুঁড় দিয়ে ফোয়ারার মত জল ছড়িয়ে দিল দেহে, তারপর পেট পুরে জল খেয়ে নিয়ে যেমন পাগলের মত ছুটে এসেছিল তেমনি বেগে ছুটে চলে গেল বনের ভেতর।

ঝিকমিকের দল বনঝাউয়ের রাজ্য ছাড়িয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছে দক্ষিণমুখো। পথে কচি ঘাস আর বুনো গুল্মের অভাব নেই। বাতাস দক্ষিণ থেকে উত্তরে বয়ে চলেছে, তাতে মহুয়া ফুলের ঝিমঝিমে গন্ধ। দলটাকে ঠিক রেখে অল্প থেমে থেমে এগিয়ে চলেছে হরিণের দল। ঝিকমিক মাঝে মাঝে থেমে বাতাসে মুখ তুলে ঘ্রাণ নিচ্ছে। আগের পথে আছে কি বিপদ? না পথ শত্রুহীন? সামনে দীর্ঘ কেলিকদম্বের বন আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। নিচে ঝরাপাতার রাশে মাঝে মাঝে দমকা বাতাসের ঘুর্নি খেলা।

ঝিকমিক সামনের পথেই শত্রুর অস্তিত্ব অনুভব করেছিল, কিন্তু তখন তার দলকে অনুসরণ করে পেছনে যে এক ভয়ঙ্কর শত্রু চোরের মত টিপে টিপে এগিয়ে আসছিল, সেটা তার মত অভিজ্ঞ নায়কও যে টের পায়নি তার কারণ, বাতাস তখন উল্টোমুখো, আর ঝরা পাতার রাশে হাওয়াতেই স্বাভাবিক একটা শব্দ হচ্ছিল—খস্ খস্। বাঘের পায়ের প্রায়-নিঃশব্দ আওয়াজ ঝরা পাতার ঘুর্নির শব্দের মধ্যেই মিলিয়ে যাচ্ছিল। শিকারী রাজা এই দীর্ঘ, বিস্তৃত বনের প্রায় একচ্ছত্র অধিপতি। তার দীর্ঘ সাবলীল সোনালি দেহে কালো কালো লম্বা ডোরা ডোরা দাগ। তার ওপর সূর্যরশ্মি পড়ে থেকে-থেকে ঝলসে উঠছিল যেন। রাজার তীক্ষ্ণ চোখ তখন জ্বলছে আর গতিভঙ্গী তার অদ্ভুত। সে গুঁড়ি মেরে শুঁয়োপোকার মত সমস্ত শরীরে একটা সর্পিল ঢেউ তুলে বুকে হাঁটছিল আর থেকে-থেকে ঝিকমিকের সবল কাঁধটার দিকে চেয়ে জিভ বার করে ঠোঁট চাটছিল। এবারে ওই হরিণের দল তার খাবার মধ্যে এসে গেছে। কতবার, কতবার ওই হরিণের সর্দার তাকে ফাঁকি দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে দল নিয়ে পালিয়েছে! ওই হরিণটা বেজায় চালাক। কিন্তু আজ? আজ আর তার তাক্ ফস্কাবে না। রাজা শরীরটা কুঁকড়ে ধনুকের মত ভুমড়ে লাফাবার জন্যে তৈরি হয়েছে,—হঠাৎ পেছনের বনে কি ঝড় উঠল?

ও কী? কিসের শব্দ? মট মট, মট মট করে ডাল আর বনের গাছ ভাঙতে ভাঙতে ওটা কী? চমকে ঘাড় ফিরিয়ে রাজা দেখল, একটা পাগলা দাঁতাল হাতী উড়ন্ত পাহাড়ের মত তার দিকে ছুটে আসছে। চোখে তার আক্রমণ সুস্পষ্ট।

সম্বরের দল চোখের নিমেষে হাওয়া। নিমেষের জন্যে বেঁচে গেল ঝিকমিক।

রাজার ক্রুদ্ধ গম্ভীর গর্জনে বন গম-গম করে উঠেছে। অনেকগুলো ক্ষিপ্র পায়ের দ্রুত দৌড়ের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মুহূর্তে রাজা পিছলে

ঘুরে হাতীটার মাথা লক্ষ্য করে লাফ মারল। বনের অধিপতি হলেও কেঁদো বাঘও হাতীদের ঘাঁটায় না। কিন্তু রাজার তখন আর উপায় ছিল না। হাতীটা তখন প্রায় অতর্কিতে তার ওপর এসে পড়েছিল।

দাঁতাল হাতীটা তার প্রশস্ত দাঁতের ওপর লুফে নিল রাজাকে। কিন্তু সে একটা ভুল করেছিল। শুঁড়টা সে গুটিয়ে রাখেনি মুখে।

সে আশা করেনি যে বাঘটা এত চকিতে ঘুরে তাকেই আক্রমণ করতে পারবে। শুঁড়টা যদি সে গুটিয়ে রাখতে পারত তাহলে ওইখানেই রাজার শেষ হয়ে যেত, কারণ হাতীদের প্রধান অস্ত্রই শুঁড়। ওটা বাগানো থাকলে দাঁতের ওপর বাঘকে লুফে নিয়ে নিমেষে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে বাঘকে টেনে এনে পায়ের তলায় থেঁতলে দিত। কিন্তু তার শুঁড়ের আসল পেশীটার ওপরেই লাফিয়ে পড়ে রাজা কামড়ে ধরেছে, আর তার ধারালো থাবা বিশাল বেগে পড়েছে চোখের ওপর আর মাথার খুলির ওপর। শান্ত নিবিড় বনে সে এক অদ্ভুত মেশানো আর্তনাদ। বাঘের কামড়ে-ধরা চাপা গর্জন আর যন্ত্রণায় পাগল-হওয়া হাতীর তীক্ষ্ণ বৃংহিত। অনেক চেষ্টাতেও পাগলা হাতীটা শুঁড় তুলতে পারছে না। এদিকে রক্তে প্রায় বুজে এল তার চোখ। বাঘটা সমেত দুপা পেছিয়ে এল হাতীটা, তারপর যন্ত্রণায় চেঁচাতে চেঁচাতে পাগলের মত রাজাকে নিয়ে একটা বড় গাছে প্রচণ্ড একটা ঢুঁ মারল। পাগলা হাতীর সেই প্রচণ্ড ঢুঁয়ে রাজার মনে হল, তার সমস্ত শরীরটা যেন গুঁড়িয়ে গেছে। কামড় তার আলগা হয়ে গেল, পৃথিবী কাঁপছে। শরীরের পেশীগুলো শিথিল হয়ে যাওয়ায় সে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু হাতীটারও তখন যথেষ্ট হয়েছে। যন্ত্রণায় চেঁচাতে চেঁচাতে সে বনের একদিক লক্ষ্য করে ছুট মারল, আর একটু সামলে নিয়ে গম্ভীর হুঙ্কার করে উঠল রাজা। সে হুঙ্কার জয়ের ঘোষণা, প্রতিদ্বন্দ্বের আহ্বান।

দুই

প্রশস্ত জলাটার বুকে সন্ধ্যা নেমে আসছে। রোদের রং রাঙা হয়ে এল। দূরের পাহাড়ের চূড়াগুলো যেন তামা। জলার বুকে পাখির দলের কলরব আবার প্রখর হয়ে উঠেছে। টকটকে লাল প্রকাণ্ড সূর্যটা দিকচক্রবালে একটা অনুচ্চ শৈলমালার ওপর হেলে পড়েছে। ওধারে একটা রক্ত-পলাশের গাছ যেন ফুলের ভারে নিচু হয়ে জলার জলে নিজের ছায়াটা দেখতে ব্যস্ত।

হঁক হঁক! হঁক হঁক!

লাল হাঁসের দলটা এসে ঝুপঝাপ জলায় নেমে শির-শির করে ভেসে চলেছে। বড় গাছটার মাথা থেকে একঝাঁক সাদা বক হঠাৎ পত পত করে আকাশে উঠে পাখা চালালো সাঁই সাঁই। এই লাল হাঁসের দলটা ম্যালার্ড জাতের। বসন্তের গোড়া থেকেই এদের পুরুষগুলোর মধ্যে একটা অস্থিরতা দেখা দেয়। তখন তাদের জোড় বাঁধবার সময়। এদের এক-একটা মাদী হাঁস জলে নির্বিকারভাবে ভাসতে থাকে, আর তাদের ঘিরে পুরুষ ম্যালার্ডগুলো নানারকম সগর্ব কসরৎ দেখাতে থাকে, যতক্ষণ না একটা মাদী হাঁস তার জোড় বেছে নেয়। এদের পুরুষ হাঁসগুলো দেখতে অপরূপ। বুকটা এদের নরম টুকটুকে লাল পালকে ভর্তি, তার নিচে পেটটা ধবধবে সাদা। মাথাটায় ও লাল গলায় একটু ময়ূরকণ্ঠী সবুজের ছোপ আর ডানাগুলোয় সাদা আর লাল ছিটে অপরূপ মেশানো। পুচ্ছগুলো আবার ধবধবে সাদা।

এইরকম একটা হংসীকে ঘিরে তিনটে হাঁস মহা কলরব লাগিয়ে দিয়েছিল। একটা হাঁস ল্যাজে ভর দিয়ে প্রায় জলের ওপর দাঁড়িয়ে উঠেছে, মাথাটা সে পেছিয়ে নিয়ে প্রায় পিঠের ওপর টেনে এনেছে, বুকটা চিতোনো। যেন সে গর্বভরে বুকের রঙীন পালকগুলো দেখাতে চায়। একটা হাঁস জলের সঙ্গে সমান হয়ে তীরবেগে জল কেটে হংসীটার দিকে আসছে। সাদা পুচ্ছটা তার জলের ওপর পাখার মত মেলা; রঙীন গলাটা লম্বা, বিস্তৃত। আর-একটা হাঁস জলের ওপর ডানা ঝাপটে আর পুঁক পুঁক শব্দ করে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। হঠাৎ মাদী হাঁসটা একটা পেঁয়াক শব্দ করে আকাশে উঠল লাফিয়ে, তীরবেগে চালিয়ে দিল পাখা। সেটা যেন তার একটা প্রতিযোগিতার ডাক—কে আমাকে ধরতে পারে? সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে উঠল তিনটে হাঁস আর আকাশে মেলে দিল তাদের গর্বিত রঙীন পাখা।

সাঁই সাঁই সাঁই।

দুটো ম্যালার্ড পেছনে পড়ে রইল। শুধু যে হাঁসটা জলের ওপর তার গর্বিত পুচ্ছ পাখার মত মেলে জল কেটে খেলা দেখাচ্ছিল, যার বুকের রঙটা গভীরতর লাল, সে তীরবেগে এগিয়ে প্রায় ধরে ফেলল হংসীটাকে।

হংসীটা চেঁচিয়ে উঠল—পেঁয়াক পেঁয়াক, পেঁয়াক পেঁয়াক! সেটা যেন একটা উত্তেজনাময় ভীত অথচ আনন্দধ্বনি। ততক্ষণে হাঁসটা এসে হংসীটাকে মেরেছে এক ঠোকর।

পুঃ পুঃ পুক! হংসীটা ঘুরে স্পর্শ করল হাঁসকে, তারপরে পাখা বিছিয়ে ঘুরে ঘুরে নামতে লাগল তারা। জলায় পড়ন্ত সূর্যের লাল জলে তাদের ছায়া কাঁপছে। হাঁসটা জয় করেছে ওই হংসীকে। জলার পাড়ে খড়কুটো, ভাঙা ডাল দিয়ে বাসা বাঁধবে। পুরুষ ম্যালার্ডটা একটা আনন্দধ্বনি করে হাওয়ায় ঢেউ খেলিয়ে ভাসতে ভাসতে তার

ওড়ার কসরৎ দেখাতে লাগল। আর ঠিক সেই সময় কালো-হয়ে আসা আকাশের নীল কোল থেকে একটা কালো বিন্দু নেমে এল সোঁ সোঁ করে। কী তীব্র তার গতি! প্রচণ্ড তীরের ফলার মত বেগ।

শিক্‌রে বাজটা দূরে বহু উঁচু থেকেই এই হাঁসটাকে লক্ষ্য করেছিল। তার দূরবীন চোখ বাঁধা ছিল ওই মেটে লালচে-সাদা হংসীটার ওপর। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ বিদ্যুতের মত সে ঝাঁপিয়ে পড়ল হংসীটার ওপর। নিমেষে নখ দিয়ে থাবায় আঁকড়ে ধরে সে হংসীটাকে নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে লাগল। শিক্‌রেদের শিকারের প্রশস্ত সময় দিন আর রাতের সন্ধিক্ষণের মুহূর্ত।

করুণ একটা আর্তনাদ করতে করতে ম্যালার্ড হাঁসটা জলার ওপর উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সঙ্গিনীকে হারিয়ে কিছুতেই সে জলায় নেমে যেতে পারল না। সঙ্গীহারার সেই আর্তনাদ জলার বনে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

আকাশে চাঁদ উঠল, মস্ত একটা সোনালি গোলা। বনজ্যোৎস্নায় ভরে গেল পৃথিবী। মহুয়া আর লিলির সুবাস চন্দ্রালোকে কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে যেতে লাগল। পৃথিবী নিস্পন্দ, আর সেই নিস্পন্দ নিঃশব্দ জ্যোৎস্নায় বনলোক ভেদ করে ম্যালার্ড হাঁসটার করুণ ডাকের বিরাম ছিল না।

আকাশের চাঁদ দূর পাড়ি দিয়েছে। চাঁদের আলোর স্তিমিত আভায় বনভূমি গম্ভীর। চাঁদের দিক-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আলো আর ছায়া লুকোচুরি খেলছে নিজেদের সঙ্গে। বাতাসে গাছের মাথায় মাথায় চাঁদের আলোয় প্রতিফলিত পাতাগুলো কাঁপছে। সেই আলোছায়ায় মনে হয়, কিরণ-মাখা অশরীরী পরীরা যেন ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল আনাগোনা করছে। হঠাৎ বনভূমির নিস্তব্ধতা ভেঙে সম্বরের অদ্ভুত ডাক শোনা যায়। সে ডাক বেশ চড়া, ভাঙা-ভাঙা, গম্ভীর।

বনের ভেতর প্রতিধ্বনি তুলে সে ডাক আকাশে কাঁপতে কাঁপতে ছড়িয়ে যায়। কাশবনের নিবিড় ঝোপে বসে রাজার কানছুটো সজাগ হয়ে ওঠে। আবার স্তব্ধতা। শুধু শিশির পড়ার টুপটাপ শব্দ আর বাতাসের পাতার রাশির ভেতর দিয়ে চলার মৃদু শিরশির শব্দে মনে হয় যেন পরীরা চুপি চুপি কথা কইছে। জলার পাড়ে ঝিমন্ত একটা হাঁস পেঁয়াক করে দলকে সাবধান করে দেয়। হুস্ করে মাথার ওপর রাতচরা পেঁচার পাখার আওয়াজ।

জলার জলে লতিয়ে পড়েছে বনলতার দল। তারই আড়ালে আড়ালে জ্যোৎস্নামাখা পরীরা কি কালো চুল মেলে দিয়ে স্নান করে? জলার বুকের স্বচ্ছ সাদা মুখগুলো কি ভাসন্ত পরীদের মুখ, না আধফোটা লিলির কুঁড়ি?

বহুদূর থেকে ভেসে-আসা একটা দলের দৌড়ের ভীত পদশব্দ ভেসে আসে। নীলগাইএর জেরা দৌড়োচ্ছে। কে তাড়া করেছে তাদের? রাতের মায়া ভেঙে একসঙ্গে অনেকগুলো অদ্ভুত কুকুরের মত ডাক আকাশে কাঁপতে কাঁপতে ছড়িয়ে পড়ে। ভয়ঙ্কর করগড়ির দল তাদের আক্রমণ শুরু করেছে। বিজাশালের বনে ঝিকমিক মৃদু, অনুচ্চ, সাবধানী ডাক ডেকে ওঠে। নিচের বনে আর তাদের জায়গা নেই। করগড়ির দল এসেছে বনে। সম্বরদের পরম শত্রু তারা। রাতের আলোছায়াতেই পাহাড়মুখো পা চালায় সম্বরের দল। আগে একটা বড় হরিণী পথ দেখায়, পেছনে ঝিকমিক—বাতাসে ঘ্রাণ নিতে নিতে, দলকে আগলে, ইতস্তত চোখ রেখে, কানছুটো খাড়া করে।

ভোরের আলো তখন বিজাশালের মাথা সবে স্পর্শ করেছে। শালের মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে আছে মহুল গাছের দল। মহুল ফুলের লোভে লোভে জুটেছে ছুটো ভাল্লুক। ভোরের আলোর আভাস পেতেই ভাল্লুকেরা পা চালায়। রাত-ভোর মহুল ফুল খেয়ে

দিনটা তাদের বিশ্রামের সময়। দিনের বেলা ঘুমোয় ভাল্লুকেরা। ক্বচিৎ কখনও বনে উইয়ের ঢিপির সন্ধান পেলে তার সৎকারে লেগে যায় তারা। উইপোকা ভাল্লুকদের বড় প্রিয় খাদ্য। একটা উইয়ের মস্ত শক্ত ঢিপি নিমেষে গর্ত করে ফেলে খুঁটে খুঁটে উইগুলো খেতে বেশিক্ষণ লাগেনা ভাল্লুকের। ভাল্লুকের নখে প্রচণ্ড ধার আর থাবায় ভীষণ শক্তি।

ভাল্লুকদুটো চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ বনভূমি নির্জন। তারপরে গাছের ফাঁকে ফাঁকে কারা যেন নড়ে ওঠে। নিঃশব্দে মাটি শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে আসে কয়েকটা প্রাণী। প্রথমে একটাকে দেখা যায়। ক্রমে ক্রমে আধখানা চাঁদের মত গোল হয়ে বেরিয়ে আসে প্রায় দশটা করগড়ি। বিজাশালের বনে এসে তারা থমকে দাঁড়ায়। পালের গোদাটা নিচু একটা শব্দ করে ওঠে। গোল হয়ে গোদাকে ঘিরে বসে যায় করগড়ির দল। তাদের মন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়।

লালচে হলদে করগড়ি একরকম বুনো কুকুর, দেখতে সাধারণ বাংলার কুকুরেরই মত। দেহেও তাদের শক্তি শরীরেরই অনুপাতে। একটা করগড়িকে বনের সবচেয়ে ভীরু প্রাণী চিত্রল হরিণও বোধহয় ভয় পাবে না। অথচ এই করগড়ির দল বনের বিভীষিকা। এদের শক্তি দল বেঁধে। এরা শিকারী জন্তু। সব কাজ এদের সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ; এমনকি দলের শাসন এবং পরিচালনাও। এরা আক্রমণ করে দল বেঁধে, মারে দল বেঁধে এবং মরে দল বেঁধে। শিকারকে ভোগও করে দল বেঁধে।

বুনো করগড়ি ভাষায় তাদের সভা চলছিল।

গোদাটা বলল, সম্বরের দল এই পথে গেছে রাতে। এখনও তাদের ক্ষুরের গন্ধ লেগে আছে মাটিতে।

বাঁ পাশ থেকে একটা করগড়ি বলে উঠল, কিন্তু একটা বাঘ পেছু নিয়েছে তাদের।

বাঘ, না প্যান্থার ? জিজ্ঞেস করল একজন।

মাটি শুঁকে দেখ।

গোদাটা বলল, কিন্তু ওই বুনো বেরালটাকে কি আমরা ভয় পাই?

দল নীরব।

ভয় পাই আমরা ?

কিন্তু, জবাব দিল আর-একটা করগড়ি, এটা সেই কেঁদো বেরাল, বনের রাজা।

রাজা একটা, কিন্তু করগড়ি দশটা।

দল আবার নীরব।

সম্বরের দলটাকে আমাদের মুখ থেকে এমনি বেরিয়ে যেতে দেব?

বন-কুকুরের মিলিত চিৎকারে কেঁপে উঠল বন। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে গেল করগড়ির দল। তারপরে মাটিতে মুখ রেখে ফোঁস ফোঁস করে শুঁকতে শুঁকতে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে অথচ দল রেখে দ্রুত ছুটে চলল তারা। দশটা জানোয়ার, কিন্তু লক্ষ্য তাদের এক।

* * * *

রাতে সম্বরের দলের ডাক শুনে রাজা সত্যি-সত্যিই পেছু নিয়েছিল ঝিকমিকের দলের। বুনো পাগলা হাতীটার জন্যে শিকার থেকে ভ্রষ্ট হয়ে রাজার রাগ আরও বেড়ে গিয়েছিল। এমন খাবার ভেতর থেকে পালালো হরিণের দলটা! আর কি তাদের পাওয়া যাবে? বিশেষত এই হরিণের দলের নায়কটা বিশেষ চালাক এবং অভিজ্ঞ। একবার লোভ হয়েছিল তার যে হরিণের দলটাকে অনুসরণ করে, কিন্তু তাদের ওই সুচতুর নায়কের কথা ভেবে সে-লোভ সম্বরণ করেছিল রাজা।

এদিকে মুহূর্তের জন্যে বেঁচে গিয়ে ঝিকমিকও চট করে তার কাজের ধারা ঠিক করে নিল। সে ধরে নিল যে ওই কেঁদো ভয়ানক বাঘটা তাদের অনুসরণ করবে। দলের সবল হরিণগুলোর পায়ে

ক্ষিপ্রতার অভাব নেই, তাদের নিয়ে সে বাঘকে ফাঁকি দিতে পারে; কিন্তু দলে বাচ্ছা রয়েছে। তাই কয়েক লাফে কেলিকদম্বের বন পার হয়ে গিয়ে হঠাৎ দলকে থামবার ইঙ্গিত করে ডেকে উঠল ঝিকমিক। দলটা নিমেষে দাঁড়িয়ে গেল স্থির হয়ে। কয়েকটা মুহূর্ত লাগল ঝিকমিকের পথ ঠিক করতে। তারপরে হঠাৎ ফিরে সে উত্তর-পুবে বিজাশালের বনের দিকে পথ দেখালো। বাঘটা যদি তাড়া করে থাকে, যাক এগিয়ে যাক। তারা উল্টো দিকে ফিরে ফাঁকি দেবে বাঘকে। কিন্তু রাজার বুদ্ধিকে যথার্থ দাম দেয়নি ঝিকমিক। বিজাশালের বনে কেটে গেল রাত। আর সেখান থেকেই ভয়ঙ্কর করগড়ি-দলের আভাস পেয়ে চলতে শুরু করেছিল তারা। ঝিকমিক বুঝেছিল যে আর নিচের বনে তাদের জায়গা নেই। পাহাড়ের দিকে পা চালিয়েছিল তারা।

বিজাশালের বন অনেক পেছনে ফেলে এসে হঠাৎ ঝিকমিক কানদুটো খাড়া করে অনুভব করল, কে যেন তার দলটাকে অনুসরণ করছে। সাবধানী ডাক ডেকে উঠল ঝিকমিক, আর পেছনে রাজা সেই ডাকে বুঝতে পারল যে হরিণের দল টের পেয়ে গেছে। ক্ষিপ্রগতি হরিণদের দৌড়ে ধরা সহজ কথা নয়, কিন্তু বাঘের আর-একটা অস্ত্র আছে—শিকারকে ভয় পাইয়ে দেওয়া। হিংস্র গভীর গর্জনে কেঁপে কেঁপে উঠল বন। সে গর্জনে হরিণের দল ভয় পেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত; কিন্তু ঝিকমিক চেঁচিয়ে উঠল—মৃগ আর উচ্চৈঃশ্রবাকে অনুসরণ করে ছোট! ঝিকমিক পেছিয়ে এসে দলের পেছনে ছুটতে লাগল। সামনে একটা নালা-নদী। বাঘটা লাফাতে লাফাতে সাক্ষাৎ যমের মত ছুটে আসছে। গাছের দলের ভেতর একবার ঝিলিক দিয়ে উঠছে তার দেহ, একবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

পালাও, পালাও! ঝিকমিক হেঁকে উঠল কাঁপা, ভাঙা-ভাঙা, চড়া গলায়—মৃগর পেছু নাও!

আর সে নিজে কাঁধের পেশীগুলো ফুলিয়ে শিঙাল মাথাটা নিচু করে ঘুরে দাঁড়ালো। নিজের জীবনের বিনিময়েও সে দলকে বাঁচাবে। দলের শেষ বাচ্ছাটা যখন সেই নালা-নদী পার হয়ে যাচ্ছে সেই সময় রাজা দেখল,—শিঙাল হরিণটা যুদ্ধের জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, আর তার দল পালায়। নিমেষে ঝিকমিকের কাঁধ লক্ষ্য করে লাফ দিল রাজা। প্রবল গর্জনে ভরে গেল আকাশ। কাঁধের প্রচণ্ড ভারটার ওপর ভয়ঙ্কর একটা ঝাঁকুনি দিল ঝিকমিক। হ্যাঁ, বাঘটাকে সে মাটিতে ফেলছে এইবার; ছুঁচাল শিং দিয়ে সে ফুঁড়ে ফেলবে ওকে। বাঘটার ঘাড়ে এসে পড়ার বেগে সে বসে পড়েছিল। কাঁধটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে ফেলে লাফিয়ে উঠতে গেল সে, কিন্তু কাঁধে তার যেন শক্তি নেই, পাগুলো অবশ। রাজার প্রচণ্ড থাবার আঘাতে কাঁধটা ভেঙে গেছে তার। একবার ওঠবার চেষ্টা করে মৃত্যু-কাতর চিৎকার করে উঠল ঝিকমিক। শরীরটা তার নালার পাড়ে লুটিয়ে পড়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। সেই মুহূর্তে বাঘটা আবার লাফিয়ে পড়ল তার ওপর।

*　　*　　*　　*

কারা যেন আসছে। ডাইনে? হ্যাঁ, ডাইনেই তো। না, বাঁয়ে। রাজার অদৃশ্য অনুভূতির তারে স্পন্দন। শিকারের ওপর থেকে মুখ তুলে চমকে তাকালো রাজা। ডাইনে? বাঁয়ে? মাঝখানে? কারা? কারা যেন আসছে গোল হয়ে বন ঘিরে? নির্মম বেড়াজালের মত গুটিয়ে ঝেঁটিয়ে কাদের পায়ের আওয়াজ মৃদু এবং নাছোড়বান্দা? নিশ্বাস এবং প্রশ্বাসের আওয়াজ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। কার এত সাহস শিকারী বাঘের মুখে এগিয়ে আসে? ব্যাঘাত করে তার খাওয়ার সময়? মরা হরিণটার ওপর দুটো পা রেখে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ গম্ভীর গর্জন করে উঠল রাজা।

ফোঁস ফোঁস! ফোঁস ফোঁস! শ্বাস এবং প্রশ্বাসের শব্দ নিচু,

মাটিমুখো। এগিয়ে আসছে তো আসছেই। বিরাম নেই. একাগ্র। ডাইনে, বাঁয়ে, মাঝখানে, সামনে। একটা গোল নির্মম বৃত্ত যেন ছোট থেকে আরও ছোট হয়ে আসছে তাকেই ঘিরে।

গ র্ র্! গ র্ র্! অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশে বিরক্ত ক্রোধ জানিয়ে উঠল রাজা।

আর প্রথমে দীর্ঘ গাছগুলোর আড়াল দিয়ে সামনেই দেখা গেল পালের গোদা করগড়িটাকে।

তার ভয়ঙ্কর দাঁতগুলো বার করে খিঁচিয়ে উঠল রাজা। আর হঠাৎ ডাইনে, বাঁয়ে, মাঝখানে, পিলপিল করে বেরিয়ে এল করগড়ির দল। পিঠের শিরদাঁড়াটা বেঁকিয়ে মাথাটা নিচু করে রাগী একটা হুঙ্কার ছাড়ল বাঘ।

করগড়ির দলের ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা বেশ একটু দূরে সেই কেঁদো বেরালটাকে ঘিরে বসে পড়েছে। চোখ তাদের একলক্ষ্যো কেঁদো বেরালটার চোখে।

আকাশে মুখ তুলে অদ্ভুত একটা অনুচ্চ ডাক ডেকে উঠল গোদা করগড়িটা।

হরিণ, হরিণ!

হতভাগা কেঁদো বেরালটার থাবার নিচে হরিণ, হরিণ! করগড়ির দলের মেলানো ডাক বাতাসে ছড়িয়ে যায়।

রাজার প্রচণ্ড রাগী হুঙ্কারে বন গমগমিয়ে ওঠে। শিকারকে আগলে মুখটা তাব খিঁচোনো, দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে।

আমরা ভয় পাই? গোঁদাটার চিৎকার।

একটা কেঁদো বেরাল, কিন্তু করগড়ি দশটা! দলের ধুয়ো দলে ছড়িয়ে পড়ে। অকস্মাৎ একসঙ্গে করগড়ির দল ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজার ওপর। মিলিত একটা গর্জন আর হু-উ-উ হো শব্দে বন ভরে ওঠে। একটা করগড়ি বাঘের থাবার নিচে, আর একটা

পিঠ ভেঙে মৃত্যুকাতর আর্তনাদ করতে থাকে। কিন্তু করগড়ির দলের সম্মিলিত আক্রমণে রাজা তখন পাগলা হয়ে উঠেছে। দুটো তার দুই থাবা কামড়ে আটকে পড়েছে। দুটো পিঠের ওপর। তিনটে পেছনের পায়ে আর গোদাটা মাথার ওপর। করগড়িরা কামড়ে ধরে জোঁকের মত আটকে থাকে। বাঘটা লাফিয়ে ওঠে কিন্তু করগড়ির দল নাছোড়বান্দা, কামড়ে ঝুলে থাকে।

রাজা হঠাৎ লাফিয়ে আর্তনাদ করে শরীরের লোমগুলো ফুলিয়ে একটা ঝাঁকুনি দেয়। নাছোড়বান্দা করগড়িরা ছাড়ে না। শিকার ফেলে রাগে গজরাতে গজরাতে ছুটতে থাকে রাজা। হঠাৎ ঝুপ-ঝাপ কামড় ছেড়ে লাফিয়ে পড়ে করগড়ির দল। একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে তারা, জয়ের চিৎকার, আনন্দের চিৎকার। কেঁদো বেরালটা লেজ তুলে লাফাতে লাফাতে পালিয়েছে। দলের দুটো করগড়ি সাবাড়, কিন্তু শিকার তাদের হাতে, কেঁদো বেরালটাকে তাড়িয়েছে তারা।

পিল-পিল করে এসে মরা হরিণটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা। নিমেষে তার দেহ টুকরো টুকরো হয়ে ভাগ হয়ে যায়। এমনকি দলের মরা করগড়িদুটোও বাদ যায় না। খাদ্য নষ্ট করে না করগড়িরা। যে-কোনো টাটকা মাংসই খাদ্য।

তিন

সম্বরের দল ছুটে চলল ওপরের জঙ্গল পানে। আজ তাদের নায়ক নেই। অভিজ্ঞ দলনায়কের অভাবে তারা দিক হারিয়ে ছুটেছে। তবে এইটুকু শুধু অনুভূতির বলে বুঝেছিল মৃগ যে তাদের এখন থামলে চলবে না। পেছনে আছে ভয়ঙ্কর শত্রু। রক্তপলাশের বন তারা পেছনে ফেলে এল, বনঝাউয়ের দীর্ঘ চূড়া অনেক, অনেক পেছনে। শালের বন এখানে শুরু, মহুলের দল ছড়িয়ে আছে, পথ চড়াই। সেই চড়াই পথে মহুলের বন থেকে ভাল্লুকের জোড় হরিণদের ক্ষিপ্র পালানো লক্ষ্য করল। উঁচু উঁচু, আরও উঁচু। পথ বুনো ফুলের সুবাসে মধুর, আর লতায় পাতায় গম্ভীর ও গভীর। পাহাড়ী ঝর্ণা নেমে বয়ে চলেছে কোথাও। কোথাও বন শান্ত, স্নিগ্ধ সবুজে সমাহিত।

অনেকখানি উঁচুতে একটা কালো পাথরের কুণ্ডীর ধারে এসে দলকে থামবার ইসারা ডাক ডেকে উঠল উচ্চৈঃশ্রবা। উচ্চৈঃশ্রবা আর মৃগ পাশাপাশি ছুটছিল, সামনে দলের এক হরিণী চলছিল পথ চালিয়ে। সূর্য তখনও দিকচক্রবালে হেলে পড়েনি। বনের পাতায় চকচকে সূর্যের কিরণের তখনও তেজ আছে। এমন সময় দলকে থামতে ইঙ্গিত করায় মৃগ একটা বিরক্তিকর শব্দ করে উঠল। এখনও সময় আছে। এখনও ওঠা যায় ওপরে, আরও, আরও গভীর বনে। তাছাড়া এই কুণ্ডীটার ধারে যেন কাদের চলার চিহ্ন

রয়েছে। বন্ধু কি শত্রু ঠিকানা নেই। মৃগ শিঙাল সম্বরের ভাঙা-ভাঙা চড়া আওয়াজে চলার আদেশ দিল। দলটা থেমে দাঁড়িয়েছিল। সমস্ত দিনের ক্লান্তি তাদের পেশীতে। সামনে কুণ্ডীর জলে স্বচ্ছ স্নিগ্ধতা। মৃগ দলকে চলার আদেশ দেওয়াতে হঠাৎ শিং নিচু করে তেড়ে এল উচ্চৈঃশ্রবা। মাথা নেড়ে প্রতিদ্বন্দ্বের ডাক ডেকে উঠল সে—আমি এখন চালাবো দল !

লাল চোখে মৃগ তাকালো তার দিকে, এ জায়গা নিরাপদ নয়। আরও উঠতে হবে সম্বরদের।

পায়ের ক্ষুর দিয়ে মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে উচ্চৈঃশ্রবা হেঁকে উঠল, সে হুকুম দেব আমি।

আবার মৃগর গলায় চলার ডাক শোনা গেল। দল তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে উচ্চৈঃশ্রবা মারল প্রচণ্ড এক ঢুঁ মৃগকে। মৃগ তৈরি ছিল না, সেই ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে মাটিতে এবং চকিতে বিদ্যুতের মত লাফিয়ে উঠে রাগী নিচু একটা গর্জন করে উঠল। চোখদুটো তার আরও লাল হয়ে উঠেছে। হরিণীর দল ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। সেই সময় দ্বিগুণ বেগে উচ্চৈঃশ্রবা মাথা নিচু করে তেড়ে আসছিল তার দিকে। নিমেষে মৃগ পাশে সরে গিয়ে কাটিয়ে নিল তার আক্রমণ এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের গতি নিয়ে প্রচণ্ড এক পাল্টা ঢুঁ লাগালো উচ্চৈঃশ্রবাকে। সে ধাক্কা সামলাতে পারেনি উচ্চৈঃশ্রবা ; একেবারে উল্টে পড়ল সে। কিন্তু পড়ন্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে আর আক্রমণ করল না মৃগ। সে তখন তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উঠুক ও ! আজ এই রক্ত-সন্ধ্যায় তাদের বোঝাপড়া হওয়া দরকার, কে হবে দল-নায়ক ! সামনা-সামনি প্রতিদ্বন্দ্বেই যুঝতে হবে, কৌশলে নয়। শক্তিতে আর ক্ষিপ্রতায় যে বড়, সে-ই শুধু দল চালাবার উপযোগী।

তারপর খানিকক্ষণ শুধু ধাক্কার পর ধাক্কা, ঢুঁএর উপর ঢুঁ। সূর্য

বনের মাথায় পাহাড়ের আড়ালে হেলে পড়ল। মাথার ওপর সাঁই সাঁই করে উড়ে গেল একদল বাদুড়। আর সেই ঘনায়মান সন্ধ্যায় দুটো জোয়ান শিঙাল হরিণ তাদের অধিকারের দাবী নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে যুদ্ধ করতে রইল। দুজনেরই মুখে সাদা ফেনা গড়াচ্ছে, ধাক্কার বেগ আসছে কমে আর সেই সময় হঠাৎ শিঙে শিং বাধিয়ে মৃগ প্রচণ্ড একটা চাড় দিতে লাগল। সামনের পা দুটো তার মাটিতে ফাঁক হয়ে চেপে বসেছে; কাঁধের পেশীগুলো সুদীপ্ত। সেই চাড়ের বেগ সামলাতে পারল না উচ্চৈঃশ্রবা। সেই প্রচণ্ড বেগ রুখতে রুখতে ক্রমশ তার কাঁধের পেশীগুলো ফুলে উঠতে লাগল, আর হঠাৎ সহ্যের বাইরে চলে গিয়ে সেই গতি কাঁধের পেশী থেকে ছড়িয়ে গেল অন্যান্য অঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে ভারকেন্দ্র সরে গেল এবং সশব্দে পড়ে গেল সে মাটিতে।

এবার প্রতিদ্বন্দ্বীর মাটিতে পড়া দেহের প্রায় ওপরে দাঁড়িয়ে ভাঙা অথচ চড়া গলায় ঘনায়মান সন্ধ্যার আকাশ কাঁপিয়ে ডেকে উঠল মৃগ। জয়ের ডাক, প্রতিদ্বন্দ্বের ডাক। কিন্তু উচ্চৈঃশ্রবা আর উঠে এল না। মাটিতে পড়েই হাঁফাতে লাগল।

একবার আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আবার দলকে সাবধানে চলার ডাক ডেকে উঠল মৃগ। কুণ্ডীর পথে কার যেন চলার পথ! হরিণদের ওটা নিরাপদ জায়গা নয়। আর সেই কুণ্ডীর পাশেই আশ্রয় নিল উচ্চৈঃশ্রবা! দল এগিয়ে চলে গেল। ও দলে আর তার স্থান নেই!

-

নির্জন বনপ্রান্তরের মাথায় জ্যোৎস্না যেন অকস্মাৎ ফেটে ছড়িয়ে গেল। কালো পাথর-ছড়ানো জমির মাঝে-মাঝে চকচকে সাদা বালির ওপর চাঁদের কুচিগুলো যেন ধূলি-গুঁড়ো হয়ে মিশে গেছে। দেখতে দেখতে প্রান্তর বিছিয়ে দুধলি ফুলের দল ফুটে উঠে জ্যোৎস্না-

স্নাতা রাতে ছড়িয়ে দিল সুবাস। কালো কালো গাছের দল নীরব প্রহরীর মত আকাশে মাথা তুলে নিশ্চুপ। আলোয় আর ছায়ায়, সাদায় আর কালোয় মিশে মিশে বনভূমি ভয়-মেশানো গম্ভীর। কুণ্ডীর কালো জলে থেকে-থেকে আলোর ঝিকিমিকি।

সেই নির্জন কুণ্ডীর একধারে নিথর বসে ছিল উচ্চৈঃশ্রবা। বড় বড় বুনো ঘাস তার পিঠ-সমান ঝাঁপিয়ে উঠেছে। এতটুকু স্পন্দন নেই তার শরীরে। হরিণদের বিশ্রাম ওইরকম নিস্পন্দ। কোন শত্রু তাদের ঠিকানাও জানতে পারে না সে সময়। আজ সে হেরে গেছে ; তার প্রিয় আজন্মপরিচিত দল থেকে আজ সে বিচ্ছিন্ন। কাল থেকে আবার নিঃসঙ্গ জীবন নতুন করে শুরু করতে হবে। কতদিনে সে পাবে আবার একটা নতুন দলের দেখা ? যাক, কালকের কথা কাল সুর্য ওঠার পর স্থির করা যাবে।

আশেপাশে ঘাসের ডগাগুলোয় ঈষৎ স্পন্দন, ঝির-ঝির করে গাছের পাতার দলের ভেতর দিয়ে এক ঝলক বাতাস বয়ে গেল। বাতাসে কাঁপছে ঘাসের ডগা। অতি মৃদু সর্ সর্ শব্দ। ঘাসের ভেতর ঘুর্নি হাওয়ার ক্ষ্যাপা খেলা ? উচ্চৈঃশ্রবার কান খাড়া হয়ে উঠেছে, আর হঠাৎ দুহাত দূরেই হিস্ করে ফণা ধরে লাফিয়ে উঠেছে এক প্রকাণ্ড সাপ। চাঁদের আলোয় তার ছড়ানো চক্রের ওপর গোক্ষুর চিহ্নটা চকচক করছে !

হিস্ হিস্ হিস্ !

সভয়ে উচ্চৈঃশ্রবা দেখল, বিদ্যুতের মত আশপাশ থেকে আরও চার-পাঁচটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অহিরাজ শঙ্খচূড় চাকার মত ফণা তুলে সক্রোধে গর্জন করে লাফিয়ে উঠেছে। মৃগ ঠিকই বলেছিল, এ জায়গাটা হরিণদের পক্ষে নিরাপদ নয়। আর সে কিনা একেবারে এই কুণ্ডীর সাপ-ডহরের ওপর শুয়ে আছে !

সাপের দলের ফণাগুলো দুলছে। একেবারে সাক্ষাৎ মরণ

সামনে। উচ্চৈঃশ্রবা বুঝতে পেরেছিল যে সেইসময় তার শরীরে এতটুকু স্পন্দন জাগলেও বিদ্যুতের মত ওই চারটে পাঁচটা ছোবল পড়বে তার ওপর।

ঠিক সেই সময় যেন পাশে থেকেই শিঙাল সম্বরের চড়া উঁচু ভাঙা-ভাঙা গম্ভীর ডাক নিস্তব্ধ আকাশে ছড়িয়ে গেল। চমকে বিদ্যুতের মত মাথা ঘোরালো সাপের দল।

* * *

উচ্চৈঃশ্রবাকে আছড়ে ফেলে দলকে নিয়ে এগিয়ে গেল মৃগ। তার অনুভূতি তাকে বলেছিল যে কুণ্ডীর ধারটা নিরাপদ নয়। কিন্তু কেন? কী দেখে সে অস্বস্তি পেয়েছিল সে নিজেই ভেবে পাচ্ছিল না। কুণ্ডীর ধারটা বুনো ঘাসে ঢাকা। তার মধ্যে হয়ত-বা সামান্য সরু একটা পথের মত বনের ভেতর পাহাড়ে চলে গেছে। কোন্ জানোয়ারের ডহর হতে পারে ওটা? বাঘের চলার পথ হতে পারে না। বাঘ-ডহর অমন সরু হয় না। হাতী যায় বনকে থেঁৎলে। বুনো শুয়োরের চলা বনকে বিধ্বস্ত করে। তবে, তবে ওটা কী? বিগত দলপতি ঝিকমিকের শিক্ষার কথাগুলো সে ভাবতে লাগল। বাঘ? শুয়োর? প্যান্থার? সাপ? হঠাৎ চমকে উঠল মৃগ। ওই তো, ওই তো সাপ-ডহর! বিষধর ভয়ঙ্কর অহিরাজ শঙ্খচূড়দের কুণ্ডীর জলে চলার পথ! আর সেই পথের ওপরেই সে ফেলে এল উচ্চৈঃশ্রবাকে—তার দলের ছেলেবেলা থেকে জানা একজনকে!

চাঁদ উঠেছে গাছের মাথায়। গাছের দলের নিচে নিশ্চিন্ত ছায়া। দলকে সেখানে থেমে বিশ্রামের হুকুম দিয়ে নিঃশব্দে কুণ্ডীর দিকে ফিরে চলল মৃগ। দলের একজনকে সে দলপতি হয়ে বিপদের মুখে ফেলে আসতে পারে না। কানদুটো খাড়া রেখে নিঃশব্দ দ্রুত গতিতে সে কুণ্ডীর ধারে আসতে-আসতেই শুনতে পেল

অহিরাজ শঙ্খচূড়দের রাগী গর্জন। দুই লাফে প্রায় সে সাপ-ডহরের পাশে এসে শিঙাল হরিণের উন্মত্ত ডাক ডেকে উঠল—খবরদার, খবরদার উচ্চৈঃশ্রবা, নড়বে না!

আর সেই সাপ-ডহর জুড়ে উচ্চৈঃশ্রবা নিথর। তাকে ঘিরে চারটে পাঁচটা সাপের দীর্ঘ ফণা দুলছে।

হঠাৎ আর-একটা শিঙাল হরিণের পাগলা যুদ্ধ-ডাক শুনে চকিতে সাপেদের ফণা ঘুরে গেল। এক-একটা অহিরাজের দলে থাকে আট-দশটা সাপ। সমস্ত সাপেদের মধ্যে এই অহিরাজ শঙ্খচূড়েরাই রাজা। এরা প্রবল বিষধর, এদের মধ্যে বড় সাপগুলো

লেজে ভর দিয়ে প্রায় তিন হাত ছোবল দিয়ে উঠতে পারে। দল বেঁধে এরা আসে কুণ্ডীর জলে খেলা করতে। সেই সময় পরাক্রান্ত বড় সাপগুলো সামনে চলে আর ছোটরা পেছনে। এই সময় কোনো জানোয়ার এদের পথে পড়লে তার শেষ। যেমন হিংস্র-প্রকৃতির এরা, তেমনি কুটিল। কোনো জানোয়ার এদের চোখে পড়লেই এরা দল বেঁধে তেড়ে যায় তাকে। এরা যেমন ক্ষিপ্র তেমনি ক্রূর।

ঝিকমিকের কাছে মৃগ শুনেছিল এবং শিখেছিল এদের স্বভাব। তাই নিজের জীবন বিপন্ন করেও সে উচ্চৈঃশ্রবাকে বাঁচালো। সে তার যুদ্ধ-ডাক ডেকে উঠে শিং নাড়তে নাড়তে মাথা নিচু করে এগিয়ে এল,—যেন সে সাপের দলকে আক্রমণ করতে চায়। অন্ধকারে কোথা থেকে পায়ের কাছে যে-কোনো মুহূর্তে একটা বিষধর হিস্ করে লাফিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সে সাপ-ডহর পানে লক্ষ্য রেখেছিল, ভুলেও সে ওদের চলার পথে পা দেবে না।

এদিকে সড়াক করে সাপের দলের মাথা উচ্চৈঃশ্রবার পাশ থেকে নেমে গেল। বিদ্যুতের মত একটা সাপের ফণা গর্জে উঠল প্রায় মৃগর পায়ের কাছে। সাপেরা চকিতে উচ্চৈঃশ্রবাকে ছেড়ে মৃগকে আক্রমণ করেছে।

হিস্ হিস্ হিস্! আরও তিন-চারটে সাপের মাথা লাফিয়ে উঠল। কিন্তু ক্ষিপ্রতায় মৃগও কম যায় না। নিমেষে এক প্রচণ্ড লাফে সে ঘুরে এঁকে-বেঁকে ছুটতে ছুটতে উচ্চৈঃশ্রবার উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে উঠল—পালাও, পালাও! উচ্চৈঃশ্রবাকে আর বলতে হয়নি। কুণ্ডীর ওপার বেড়ে সে তখন ছুটেছে। হরিণের পায়ের গতির কাছে সাপেরা পারবে কেন? খানিকটা তাড়া করে সাপের দল থমকে দাঁড়িয়ে শূন্যে ছোবল মারল কয়েকটা, তারপরে মুচড়ে দুমড়ে হিস্ হিস্ করে জয়-গর্জন করতে করতে ফিরে এল তারা। সড়াক সড়াক করে

পিছলে জলে নামল সাপের দল। শত্রুকে হারিয়েছে তারা—দূর করে দিয়েছে তাদের ত্রিসীমানা থেকে। মৃদু বাতাসে জলের ছপছপে ঢেউয়ের সঙ্গে শরীরের ঢেউ খেলিয়ে তারা খেলা করতে লাগল। আকাশের উদাস চাঁদ নির্বিকার। কুণ্ডীর কালো জলে রুপোর কুচি ভেঙে ভেঙে তরল, তরলতর হয়ে যেতে লাগল।

* * * *

সাপেদের ফাঁকি দিয়ে দলে এসে পৌঁছতে মৃগর খানিকটা সময় লেগেছিল। উচ্চৈঃশ্রবা আগেই পৌঁছে গেছে। দূর থেকে দলের মাথায় তার শিঙাল কাঁধটা লক্ষ্য করে নিচু একটা গর্জন করে উঠল মৃগ। উচ্চৈঃশ্রবা এগিয়ে এসে তার গায়ে নাকটা ঘসতে লাগল। মৃগকেই সে দলনায়ক বলে মেনে নিয়েছে।

চার

বনের নিঃসঙ্গতা রাজাকে চঞ্চল করে তুলছিল কয়েকদিন থেকে। এদিকে বনে গ্রীষ্ম এসে গেল প্রায়। জলার ওপর থেকে লাল ম্যালার্ড হাঁসের দল একদিন ঊষার আলো-আঁধারিতে তাদের দূর যাযাবর যাত্রাধ্বনি তুলে উড়ে গেল—হঁক হঁক হঁক। আকাশের রঙ তামাটে হলদে হয়ে উঠতে লাগল। এবার ফাগুনে বৃষ্টি হয়নি বনে। অন্ধকার রাতের আকাশে মাথার ওপর কালপুরুষের খড়্গ যেন জ্বলে জ্বলে ঝলসায়। নির্বিকার শীতল সপ্তর্ষিমণ্ডল খুঁজে পাওয়া যায় না। বাতাসে গ্রীষ্মের আগমনী হল্কা।

ঊষার আধো-অন্ধকারে কাশবনে গা-ঢাকা দিয়ে বসে রাজা সামনের থাবাদুটো চাটছিল। গায়ের ডোরাগুলো তার কাশ-ঝোপে মিশে গেছে। জঙ্গলে নিজেকে লুকিয়ে ফেলা জানোয়ারদের কত সহজ! প্রত্যেক জানোয়ারের গায়ের রঙের সঙ্গে তার আবাসের একটা চমৎকার মেশামেশি সম্পর্ক আছে। ইচ্ছে করলেই তারা আবাসের সঙ্গে যেন এক হয়ে যেতে পারে। একটু দূরেই দুটো চিতল হরিণ লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করছে। তাদের সোনালি গায়ের রঙের ওপর সাদা সাদা ফুটকি। বিশ্রান্ত দৃষ্টিতে রাজা তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। চিতল হরিণদুটো তার অস্তিত্ব টেরও পায়নি। বনের ভয়ঙ্কর কেঁদো বাঘ যে তাদের অল্প দূরেই লুকিয়ে আছে, চিতল-দুটো একবার মনেও ভাবেনি। ইচ্ছে করলেই রাজা একলাফে ওদের

ঘাড়ে পড়ে শিকার করতে পারে। কিন্তু এখন তার প্রয়োজন নেই। এই কিছুক্ষণ হল সে একটা সজারু মেরে, আধখানা খেয়ে আধখানা লুকিয়ে রেখে এসেছে। বাঘের স্বভাব ওই। দরকারের অতিরিক্ত শিকার করেনা তারা। দরকারের অতিরিক্ত খায়ও না। অতিরিক্ত খাদ্য তারা সযত্নে লুকিয়ে রেখে আসে, যাতে মাংসাশী অন্য জানোয়ার বা পাখির নজরে না পড়ে। আবার ক্ষিধের সময় তাকেই টেনে বার করে এনে খায়। যতক্ষণ না শেষ হয় আবার শিকারের দরকার হয় না।

রাজা তাই নিশ্চিন্ত মনে বসে থাবা চাটছিল। হঠাৎ কানদুটো তার খাড়া হয়ে উঠল। দূরে, বহুদূরে একটা বাঘিনীর ডাক না? হ্যাঁ, তাইতো! রাজা লাফিয়ে উঠে আকাশে মুখ তুলে গর্জন করে উঠল—বাঘিনীর ডাকের সাড়ায়। সেই সাড়ায় চমকে ছটকে গেল চিতল হরিণদুটো। জলার বুকে ঝটপটিয়ে উঠল পাখির দল। রাজা তখন বাঘিনীর ডাক শুনে ছুটেছে। লাফের পর লাফে তীব্র গতিতে বন পার হয়ে চলেছে সে। সূর্য ধীরে ধীরে গাছের দলের মাথায় উঠেছে। পার হয়ে গেল বন-ঝাউয়ের দল। বিজাশালের বন রইল পেছনে পড়ে। নিঃসঙ্গ জীবনে এসেছে সঙ্গী পাওয়ার সম্ভাবনা। পাথর-ঢাকা শুকনো নদীগুলো যেন বাধাই নয় আজ। আর সেই তীব্র গতিতে ছুটতে ছুটতে মনের আনন্দে বন কাঁপিয়ে মেঘের মত গর্জন করে উঠল রাজা।

এমন সময় বাঘিনীর ডাক ছাপিয়ে আর-একটা হুঙ্কার কানে এল রাজার। একটা অকারণ রাগে ছটফটিয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বের গর্জন করে উঠে গতি আরও বাড়িয়ে দিল রাজা। আর সেই হুঙ্কারটাও এগিয়ে আসতে লাগল—সে গর্জনেও প্রচণ্ড রাগ আর প্রতিদ্বন্দ্বের আভাস। বনটা যেখানে অল্প ফাঁকা হয়ে গেছে, শেয়ালি লতার দল জড়িয়ে জড়িয়ে দীর্ঘ গাছের গায়ে আকাশে উঠে গেছে ঘাসের

ঝোপ, যেখানে তখনও সবুজ মখমল, সেইখানে বাঘিনীটাকে দেখতে পেল রাজা। বাঘিনীটা মাপে তার থেকে ছোট। পাটকিলে লোমগুলো তার নরম, পেটটা সরু হয়ে বুকের কাছে চিতিয়ে গেছে। চলার ভঙ্গিটা একটু ঢেউখেলানো। একটা মৃদু নিচু ডাক ডাকতে ডাকতে রাজাকে দেখে তার দীর্ঘ লেজটা নাড়ছিল বাঘিনী। এক লাফে তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে শরীরের সবল পেশীগুলো ফুলিয়ে অধিকারের ভঙ্গীতে প্রতিদ্বন্দ্বী সগর্ব গর্জন করে উঠল রাজা। এই সময়টা বাঘেদের বাচ্চা হবার সময়। জোড় বাঁধবার জন্যে বাঘেরা খুঁজে বেড়ায় সঙ্গী। বাঘিনীর জন্যে সারা বন ছুটে বেড়ায় বাঘেরা। আর বাঘিনীদের নিয়ে নিজেদের ভেতর লেগে যায় লড়াই।

আর একটু দূরের ঘাসের ঝোপের ফাঁকে আর-একটা বাঘের মুখ দেখা গেল। রাজা ততক্ষণে টান হয়ে নিচু হয়ে গেছে, পেশীগুলো তখন টানা রবারের মত বিস্তৃত। সেই সময় তীব্র ক্রুদ্ধ হুঙ্কার করে লাফ দিল সেই বাঘটা। রাজাও লাফিয়েছে। মাঝ-আকাশে লাগল ধাক্কা। তাদের মিলিত ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বন। অন্য বাঘটা অভিজ্ঞ শিকারী। মুহূর্তে সামনের থাবা চালিয়ে কৌশলে রাজাকে নিচে নিয়ে সে মাটিতে পড়ল। একবার দাঁতটা খুলির ওপর বসাতে পারলেই প্রতিদ্বন্দ্বী সাবাড়। কিন্তু রাজার তখন নতুন যৌবন, পেশীগুলোয় তার অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা। নিমেষে পিছলে বেরিয়ে এল রাজা এবং এক প্যাঁচে শত্রুকে সে তার দুই থাবার নিচে রেখে কামড়ে ধরল তার চোয়ালটা। দুটো বাঘই গড়াতে গড়াতে সেই ঘাসের বন কাঁপিয়ে তুলতে লাগল। কিন্তু রাজার কামড় ছাড়বার নয়। সবলে একটি ঝটকা দিয়ে প্রচণ্ড একটা থাবা চালালো সেই বাঘটা রাজার মাথায়। রাজা বসে গেল। মাথা ঝাঁকুনি দিচ্ছে সেই বাঘটা আর বেরালের মুখের ইঁদুরের মত ঝুটোপুটি খাচ্ছে রাজা, কিন্তু কামড় সে তার ছাড়েনি। একটুখানি দম নিতে বোধহয় থেমেছিল

সেই বাঘটা, আর নিমেষে কামড় ছেড়ে লাফ দিল রাজা। একলাফে নিচে থেকে একেবারে ঘাড়ে কামড়ে ধরল সে শক্রর। মট্ করে একটা আওয়াজ হল, আর মৃত্যু-আর্তনাদে ভরে উঠল বন। একটা চিৎকার, তারপরে গোঙানি ক্ষীণ, ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল। আর মৃত শক্রর শরীরের ওপর দুটো থাবা দিয়ে দাঁড়িয়ে রক্তাক্ত দেহে আকাশে মুখ তুলে জয়ের গর্জন করে উঠল রাজা। বাঘিনীটা আস্তে আস্তে এসে রাজার ক্ষতগুলো জিভ দিয়ে চাটতে লাগল।

রুদ্রভৈরব মূর্তি নিয়ে গ্রীষ্ম এল এবার। দুপুরের পোড়া তামার মত আগুন-ছড়ানো আকাশের দিকে তাকানো যায় না। বনঝাউয়ের দলের আধ-পোড়া মূর্তি দেখে ভয় করে! লম্বা ঘাসের ঝোপ হলদে হয়ে ঝলসে উঠল। যেদিকে তাকানো যায়, চারধার যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। মাঝে মাঝে আগুনের হল্কার মত বাতাসে বালির রাশ ক্ষ্যাপার মত উড়তে উড়তে আচ্ছন্ন করে ফেলে দিগ্বিদিক। আকাশ নীল নয়, তামাটে কটা। আকাশ শূন্য। পাখির দল দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। আর বনভূমি থেকে প্রতি তৃণ-পত্রের শিরা-উপশিরা থেকে রস শুষে একটা তাপের তরঙ্গ কাঁপতে কাঁপতে ওপরে উঠে যাচ্ছে। গ্রীষ্মের সেই ধ্বংস তাণ্ডবলীলার এক অপরূপ সৌন্দর্য। ধনগরিমাময়ী বনভূমি আজ যেন নিঃস্ব হয়ে হাঁপাচ্ছে। প্রকৃতি কাউকে এক অবস্থায় রাখেনা। জীবনের বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়তে পারার ক্ষমতা সৃষ্টির এ এক অদ্ভুত কৌশল। আজকের এই নিঃস্ব শুষ্কতার ওপর আবার নামবে জলময়ী বর্ষা, মৃত্যুর মধ্যে থেকে আবার জেগে উঠবে মৃত্যুজয়ী জীবন। সেই প্রবাহ ছড়িয়ে যাবে তরঙ্গে তরঙ্গে বনময়। কিন্তু আজকের গ্রীষ্মের এই অগ্নিময়ী ধাক্কায় বনের প্রতিটি অণু-পরমাণু যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝলসাতে শুরু করল। জলার জল শুকিয়ে দেখা দিল পাঁকের কালো মূর্তি। সমস্ত বন জলের

অভাবে আধপোড়া নগ্ন মূর্তিতে আকাশের দিকে চেয়ে হাঁপাতে লাগল।

* * *

ভাল্লুকেরা বেরিয়েছিল উই-ঢিপির সন্ধানে। ভাল্লুক-মা আর তার দুই ছানা। বনের এই নিস্তেজ জীবনের ওপর উই লাগে। উইএর দল বাড়তে বাড়তে গড়ে তোলে এক-একটা মস্ত ঢিপি। এই উইঢিপিগুলো ভেঙে ভেঙে খুঁটে খুঁটে উইগুলো খেতে ভাল্লুকদের মহা আনন্দ। ভাল্লুক-মা তার ছানাদুটোকে সামনে নিয়ে নাক দিয়ে ঠেলা দিতে দিতে এগিয়ে চলেছিল।

বাচ্ছাদুটো মহা চঞ্চল। খালি ছুট্‌কে এদিক-ওদিক চলে যায়। ঘূর্নি হাওয়ায় উড়ন্ত শুকনো পাতার পেছনে থাবা তুলে তাড়া করে। ভাল্লুক-মা গ র্ র্ শব্দ করে বাচ্ছাদের সাবধান করে দেয়। আবার এক সময় শুকনো পাতার রাশের মধ্যে কি একটা পোকা খুঁড়তে লেগে যায় বাচ্ছাদুটো। ভাল্লুক-মা এগিয়ে যেতে যেতে থমকে পেছনে ফিরে দেখে, বাচ্ছারা সঙ্গে নেই।

গ গ র্ র্ করে ডাক দেয় ভাল্লুক-মা।

বাচ্ছাদুটোর খেয়ালই নেই।

আয়, আয়! বিরক্ত স্বরে ডাক দেয় ভাল্লুক-মা, আয় শিগগির! কেঁদো বাঘ আছে বনে।

বাচ্ছাদুটো খ্যাঁং খ্যাঁং করে হেসে ওঠে, বাঘ না ছাই!

পাতার রাশের ভেতর পোকাটাকে খুঁড়তে লেগে যায় তারা।

বুনো শুয়োরের দল বেরোবে রে, আয়!

না যাব না! বাচ্ছাদুটো হেসে ওঠে।

ভাল্লুক-মা তেড়ে এসে এক থাবড়া লাগায় একটা বাচ্ছাকে আর-একটাকে নাক দিয়ে দেয় এক ধাক্কা। থাবড়া-খাওয়া বাচ্ছাটা

আকাশে ছোট-ছোট চারটে পা তুলে চিৎপটাং হয়ে পড়ে। ভাল্লুক-মা রাগের ভাণ করে গর্জন করে ওঠে, শিগগির আয়!

বাচ্চাদুটো সুড়-সুড় করে মায়ের পেছু নেয়। মা-টা যেন কি!

হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো পায়ের দ্রুত একটা দৌড়ের শব্দে চমকে ওঠে ভাল্লুক-মা। শব্দটা যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে না? বাচ্ছাদুটোকে পেছনে আগলে রেখে দু-পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে এবার সত্যিসত্যিই সক্রোধে গর্জন করে ওঠে ভাল্লুক-মা। কে তার বুক থেকে বাচ্ছাদের ছিনিয়ে নেবে? আসুক, আসুক দেখি!

আর হঠাৎ তার চোখের সামনে দিয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে একটা বুনো শুয়োরের দল ছানাপোনা নিয়ে চলে গেল। দলের আগে একটা দাঁতাল ধাড়ি শুয়োর। শুয়োরের দলটা সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলে খানিকক্ষণ অবাক বিস্ময়ে তাদের দিকে চেয়ে রইল ভাল্লুক-মা। শুয়োরের দল যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করে, বিশেষত দাঁতাল শুয়োরগুলো। কেঁদো বাঘকেও যারা ভয় করে না, তারা এমন কিসের ভয়ে পালালো?

সেই সময় বনের নৈর্ঋত কোনেব আকাশের মাথায় একটা পট্ পট্ আওয়াজ শুনে সেদিকে তাকিয়ে সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল ভাল্লুক-মা।

ছোট ছোট! পালা পালা!

প্রচুর পাকানো পাকানো ধোঁয়ার সৈন্য সামনে নিয়ে লকলকে লাল জিভ বার করে বনের মাথায় মাথায় আগুন যেন ছুটে আসতে লাগল। দেখতে দেখতে দক্ষিণ বাতাস প্রবল হয়ে উঠল। লম্বা লম্বা ঘাস আর বন-ঝাউয়ের জঙ্গল সূর্যতাপে আধশুকনো বারুদের মত হয়ে আছে, এক-একটা স্ফুলিঙ্গ পড়ামাত্র গোটা ঝাড় জ্বলে উঠেছে—সেদিকে যতদুর দৃষ্টি যায় ঘন নীল ধোঁয়ার রাশ আর আকাশ-ছোঁয়া অগ্নিশিখা। ঝড়ের মুখে দক্ষিণ থেকে উত্তরে, বাঁকা

আগুনের শিখা ঠিক যেন একটা ক্ষ্যাপা হুরন্ত রক্ত-চোখ মোষের মত ছুটে আসছে।

দাবানল! দাবানল! সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। জঙ্গল ভেঙে ছিঁড়ে নীলগাইয়ের দল প্রাণভয়ে দৌড়ল ওপরের বন পানে। শেয়ালের দল হুয়া হুয়া করে ছুটেছে। আজ আর বাছ-বিচার নেই। কান উঁচু করে খরগোসেরা ছুটে গেল। এক-ঝাঁক বনটিয়া মাথার ওপর দিয়ে সোঁ সোঁ করে উড়ে পালালো, পেছনে গোটাকতক সিল্লী। আগুনের স্রোত সশব্দ গর্জনে ভেসে আসছে। বাঘিনীকে পাশে নিয়ে রাজা বুনো জানোয়ারদের পেছু নিয়েছে বেগে। দাবানল! দাবানল! ছুটছে আর জিভ বার করে হাঁফাচ্ছে জানোয়ারের দল। জল, জল! কোথায় একটু জল? একটু আশ্রয় আর নিরাপত্তা?

* * * *

কুণ্ডীর পাশের উঁচু বালিয়াড়ির ওপরের বটগাছটার আড়ালে সূর্য অস্তোন্মুখ। সমস্ত বনে একটা অগাধ স্তব্ধতা। নিচের থেকে ভেসে-আসা উষ্ণ বাতাস আধপোড়া রজনের গন্ধে নিবিড়। আর সেই কুণ্ডীতে নিঃশব্দে জল খাচ্ছে একদিকে রাজা আর তার সঙ্গিনী। একদিকে গুটিকয়েক নীলগাই। বুনো শুয়োরেরা জল খেতে নেমেছে একদিকে। নীলগাইয়েরা একবার কেঁদো বাঘেদের দিকে দেখছে আর বাঘদুটো নীলগাইদের দিকে দেখছে। ভাল্লুক-মা ছানাদুটোকে বুকে আগলে জলে মুখ দিয়েছে। আজ আর হিংসা নেই, দ্বেষ নেই! আজ শুধু একটা সমান বিপদে সব মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে। আর ঘনায়মান সন্ধ্যায় নিচের বন আগুনের মালায় বিভূষিত হয়ে জ্বল জ্বল, ধ্বক ধ্বক করছে।

মৃগ তখন তার দলকে নিয়ে, ভেতরে, আরও ভেতরে নিবিড়তর জঙ্গলে পাহাড়ের পানে উঠে চলেছিল, যেখানে থাকে বুনো মোষ গয়ালের দল। কুণ্ডীর ধারে বাঘেদের আবির্ভাব তাদের নজর এড়ায়নি।

পাঁচ

বিপদ এবং দুঃখের মেঘ অকস্মাৎ কালো রূপ নিয়ে দেখা দিলেও জীবনের গড়ার কাছে সেটা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। জীবন এগিয়ে চলে ; পেছনে ফিরে তাকাবার সময় তার অল্প। দাবানলে পোড়া মাটির ওপর দেখা দেয় জীবনের বীজ, নতুন অঙ্কুর। সময় তার স্থির, অগ্রগামী গতিতে এগিয়ে চলে। জলার জলে আবার নামে হাঁসের দল। নতুন গাছের দল লতায় পাতায় জড়িয়ে আবার আকাশে মাথা তুলে ওঠে।

প্রভাতের সোনালি রোদ মেখে বনভূমি নিস্পন্দ নিথর। কিন্তু কিছুক্ষণ সেই স্তব্ধতায় কান পেতে থাকলে ছোট ছোট কতরকম শব্দতরঙ্গ তোমাকে মুগ্ধ করে দেবে। বাতাসের ঢেউয়ে কচি পাতার সবুজ মর্মর, কেয়া-ঝোপের ওদিক থেকে একটানা ঝিঁঝির ডাক, দূরের জলাভূমি থেকে ভেসে-আসা কত রকমের পাখির কলরবের কাঁপা কাঁপা আওয়াজ। কাঁক আর বেনে-বৌ আর থেকে থেকে মানিক পাখির ভুতুড়ে গম্ভীর ডাক।

দূরে একটা শিমূল গাছের মাথায় বসে আছে এক-ঝাঁক সাদা বক। মনে হয় যেন গাছের মাথায় থরে থরে ফুল ফুটে আছে। আকাশে সাদা পাখার ঢেউ তুলে হঠাৎ পৎ পৎ করে উড়ে যায় বকের সার। তারপরে সবুজ ঝিলিক তুলে আসে বন-টিয়ার ঝাঁক। কিছুক্ষণ তাদের কলরবে বন ভরে যায়—চিকি চিকি চিকি, ক্যাঁ!

পাতার সবুজে মিশে যায় তাদের দেহের সবুজ, শুধু দেহহীন লাল ঠোঁটগুলো পাতার ফাঁকে ফাঁকে নড়ছে—দেখতে বেশ মজা লাগে।

হঠাৎ দূর, বহুদূর থেকে চড়া উঁচু কাঁপা-কাঁপা একটা শব্দ ভেসে আসতে থাকে—উকু, উ-উক্কু, হু-উক্কু, উ-উক্কু! শব্দটা বাড়তে বাড়তে কেঁপে কেঁপে আকাশে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে এগিয়ে আসতে থাকে। কারা যেন আসছে। আর সশব্দে গাছের ডাল থেকে ডালে ঝুলতে ঝুলতে, দুলতে দুলতে, আবির্ভাব হয় একদল লঙ্গুর বানরের। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে চলে তারা। নতুন পল্লবের শিখাগুলো তাদের ভার সয় না, কিন্তু সেগুলো ভেঙে পড়বার আগেই আনন্দ-কলরবে বন ভরে তুলে দৃঢ়তর ডালে লাফিয়ে চলে যায় তারা, সঙ্গে সঙ্গে থেকে থেকে দলের ডাক ডাকতে থাকে—কু-উক্কু, উক্কু, উক্কু! লঙ্গুরেরা বনের খেয়াল-খোলা রসিক জানোয়ার।

দলের আগে পালের গোদা গোদাবর দলকে চালিয়ে চলে, পেছনে তার সার সার বানরের পাল। বাচ্ছাগুলো মায়েদের বুক আঁকড়ে ঝুলে থাকে। গোদাবর বেশ ওজনে ভারী জানোয়ার, শরীরের রঙ তার পাটকিলে ধূসর, মুখখানা কুচকুচে কালো আর সেই কালো মুখখানা বেড়ে মাথা অবধি সাদা লোমে ঢাকা।

টুন, শিরিষ, পাখাসাজ আর শিমূলের বন যেখানে জড়াজড়ি করে ঘন হয়ে উঠেছে সেইখানে এসে একটা সাঙ্কেতিক ডাক ডেকে উঠল গোদাবর। লঙ্গুরের দল ঝুপঝাপ সব বসে গেল গাছের ডালে ডালে। বাচ্ছাগুলো মায়েদের বুক থেকে নেমে পড়ে কসরৎ দেখাতে শুরু করল। কেউ বা ল্যাজ দিয়ে একটা গাছের ডাল জড়িয়ে ধরে মাথা নিচু করে দোলে, কেউ দুপায়ে মানুষের মত দাঁড়িয়ে উঠে শূন্য ডালের ওপর টলতে টলতে চলতে থাকে। ওদিকে কিচ কিচ করে লঙ্গুরি ভাষায় নানা আলোচনা শুরু হয়ে যায়। দূরে পাহাড়ের চূড়াগুলো সূর্যকণা মেখে মেখে তামাটে হয়ে উঠতে থাকে।

একটা লঙ্গুর-গিন্নি হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল—তার বাচ্ছাটা পাওয়া যাচ্ছে না। গোদাবর কান খাড়া করে তাকালো তার দিকে। লঙ্গুর-গিন্নি তখন লাফিয়ে একটা গাছের মগডালে উঠে চেঁচাচ্ছে—হোক্কা, হোক্কা, হো-ওক্কা! কিচ কিচ কিচ! অর্থাৎ, খোকা, খোকা, অ-খোকা! কোথায় গেলি হতভাগা?

দূরে, অনেক নিচু ডালে খানিকটা পাতার আবরণের ভেতর থেকে একটা মৃদু সাড়া আসে—কু! কু! হুকু!

তিনলাফে বানর-গিন্নি গাছের পর গাছ পার হয়ে গিয়ে দেখে, খোকা তার বেশ উবু হয়ে বসে একটা আঙুল চুষতে চুষতে নিবিষ্টমনে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। দুই থাবড়া কসিয়ে দেয় বানর-গিন্নি, আর খোকা-লঙ্গুরটা কুঁই কুঁই শব্দ করতে করতে তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে থাকে আর নিচের দিকে মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে।

কুঃ কুঃ! কুঁই! বানর-বাচ্ছাটা কতরকম ভঙ্গি করে নিচে দেখায়।

ও মা! নিচের কাশ-ঝোপে যে দুটো ছোট্ট ছোট্ট বাঘের বাচ্ছা! লঙ্গুর-খোকাটার তিড়িং তিড়িং নৃত্য আরও বেড়ে ওঠে।

লঙ্গুর-খোকার সেই মৃদু অথচ উত্তেজিত ডাক শুনে হুপহাপ করে গোদাবর তার দলবল দিয়ে গাছের মাথায় এসে হাজির হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঘের বাচ্ছাদুটো তাদের নজরে পড়ে। ব্যস, চট করে রসিকতা এসে যায় মাথায়। লঙ্গুরেরা বনের রসিক জানোয়ার।

মর্কটি ভাষায় মন্ত্রণা চলেছে তখন আরে আরে, কেঁদো-বেবালের বাচ্ছা!

নরম তুলতুলে, চোখে ফুটেছে সবে। এখনও কামড়াতে জানে না।

কিন্তু কেঁদো-বেরালটা কই?

বাচ্ছা লুকিয়ে রেখে শিকারে গেছে বোধহয়। লঙ্গুরদের মত

কেঁদো-বেরালগুলো তো আর দল বেঁধে থাকতে পারে না যে দল বাচ্ছা আগলাবে!

আনবো নাকি তুলে একটাকে?

লঙ্গুরের দল খ্যাঁৎ খ্যাঁৎ করে হেসে ওঠে।

নিয়ে আয় না! বলে একজন।

কিন্তু কেঁদো-বেরালটা যদি তেড়ে আসে?

গম্ভীরভাবে গোদাবর জবাব দেয়, কেঁদো-বেরাল একটা আর লঙ্গুরেরা পঁচিশজন।

বাঘের বাচ্ছাদুটোর দুপাশে ঝুপঝাপ নেমে পড়ে বানরের দল। তারপর কেউ বা তাদের ল্যাজ ধরে টান লাগায়, কেউ একটা বাচ্ছাকে চিৎ করে ফেলে পরীক্ষা করে, কেউ বা সেই বেরালছানাটার মত বাচ্ছাদুটোকে গড়িয়ে দিয়ে মজা দেখে। কিন্তু অমন ব্যতিব্যস্ত করে তুললেও বাচ্ছাদুটোকে কোনমতে আহত করে না তারা। ওদিকে বাঘের বাচ্ছাদুটো ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে তাদের আপত্তি ও বিরক্তি জানাতে থাকে।

হঠাৎ বন কাঁপিয়ে দুরন্ত এক গর্জন।

সভয়ে বানরের দল দেখল, তীব্রবেগে বাঘিনী ছুটে আসছে তাদের দিকে।

হুক্কু, হুক্কু! উক্কু! বানরের দল বিদ্যুতের মত টুপটাপ গাছে উঠে পড়ে। কিন্তু গোদাবরের দুষ্টু বুদ্ধি তখনও যায়নি। হঠাৎ একটা বাঘের বাচ্ছাকে বগলদাবা করে সে ছুটতে শুরু করে আর সক্রোধে হুঙ্কার করতে করতে বাঘিনী তার পেছু নেয়। লাফের পর লাফে গোদাবর আর বাঘিনীর মধ্যের দূরত্ব কমে আসতে থাকে। সম্মিলিত লঙ্গুরদের ডাকে ভরে ওঠে বন। বাঘিনী যখন প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে, হঠাৎ বাচ্ছাটাকে মাটিতে রেখে দৌড়ের তালেই দুলে একটা গাছের শাখায় উঠে যায় গোদাবর। ক্রুদ্ধ বাঘিনী তাকে লক্ষ্য করে

নিষ্ফল একটা লাফ দেয় শূন্যে। গাছের শাখাটার ওপর দাঁড়িয়ে সজোরে সেটাকে নাড়া দিতে দিতে ডেকে ওঠে গোদাবর—উক্কু, উ-উক্কু, হুক্কু, উকু, উকু, উক্কু! ঠিক যেন বাঘটাকে সে ঠাট্টা করছে।

তার ডাকের ধুয়ো ধরে দলসুদ্ধ বানর ঠাট্টা করে ডেকে ওঠে। বাঘের সঙ্গে বেজায় ঠাট্টা করেছে তারা। ওদিকে বাঘিনী তখন সযত্নে বাচ্ছার ঘাড়ের কাছটা কামড়ে ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে ডেরায় ফিরে চলছে। ওই বাঘের বাচ্ছাদুটোই রাজার প্রথম বাচ্ছা।

* * * *

বনের মাথায় নীলাম্বরী বর্ষার বিদ্যুৎ-ধাঁধালো পাড় ঝলসে ওঠে। জলময় আষাঢ়ের ঘন মেঘে আকাশ কালো। গুরুগম্ভীর মেঘের দামামা বন থেকে বনে প্রতিধ্বনিত হয়ে যায়। আর অকস্মাৎ ঝুমুর-পরা মেয়ের মত ঝম-ঝম করে নাচতে নাচতে বনের মাথায় নামে বর্ষা। সমস্ত বনের জানোয়ার তখন নীরব। লঙ্গুরেরা গাছের ডালে ডালে বসে লেজ ঝুলিয়ে ভেজে। শুধু থেকে-থেকে ময়ূরের কেকাধ্বনি চমকে যায় আর এক-একবার দূরাগত হাতীর দলের আনন্দ-বৃংহিত ভিজে বাতাসে ভেসে আসে।

তারপর আকাশের রাশি রাশি কালো কুণ্ডলী মেঘের রং যখন বদলাতে থাকে, ফাটল দেখা দেয় মেঘেদের ঐক্যে, শীর্ণ পাহাড়ি নদী যখন ফুলে ফেঁপে উপলে উপলে লাফিয়ে চলে, গোদাবর আকাশের পানে তাকায়। বর্ষা-শেষে লঙ্গুরদের যাত্রা শুরু আবার ওপরের বনে, যেখানে শরতের ফল পাকে, মূল খুঁড়ে তোলে ভাল্লুকেরা। পাহাড়ে আর মেঘে তখন ছাড়াছাড়ি হতে শুরু হয়েছে। যাত্রা কি আরম্ভ এবার?

এমন এক দিনে একটা পাহাড়ি নদীতে জল খেতে নেমেছে গোদাবর। বর্ষার আগাছায় ছেয়েছে নদীর পাড়। জল খেয়ে সবেমাত্র সে মুখ তুলেছে, এমন সময় পাশ থেকে হঠাৎ একটা হিস্ হিস্

শব্দ শুনে সে জমে গেল। বিপদে জানোয়ারদের অভিভূত হলে চলে না, বিশেষত কোনো দলপতির। নিঃসাড় বসে নিমেষে গোদাবর তার মতলব ঠিক করে নেয়। এতটুকু নড়লেই মরণ! হিস্ হিস্ করতে করতে প্রায় তার মাথা-সমান উঁচু হয়ে শঙ্খচূড়ের ফণাটা দুলছে—কালো বিষধর সাপ। মাথার ওপর গাছে গাছে আতঙ্কিত বানরের দল স্তব্ধ হয়ে আছে। এ কী অঘটন! পারবে কি তাদের দলপতি এ বিপদ এড়াতে? বাঘকে সে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিতে পারে বটে, কিন্তু এ যে কিলবিলে ক্রুর কালো সাপ!

আর তার নিঃসাড়তায় সাপের ফণার দোলা যখন প্রায় থেমে এসেছে, নিমেষে বিদ্যুতের মত লাফিয়ে খপ্ করে গোদাবর সাপের মাথাটা মুঠোর ভেতর চেপে ধরল। সাপটা সেই বজ্রমুষ্টির ভেতর থেকে কিলবিলিয়ে বার হবার চেষ্টায় অকৃতকার্য হয়ে, চাবুকের মত লাফিয়ে উঠে জড়াতে লাগল গোদাবরের দেহ। আর গোদাবর তখন মুঠোর ভেতরের সাপের মাথাটা প্রাণপণে একটা পাথরের ওপর ঘসছে, কারণ সে জানে যে একটু সময় পেলেই সাপটা তাকে জড়িয়ে এমন মোচড় দিতে শুরু করবে যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে জিভ তার বেরিয়ে আসবে, সে বাধ্য হবে মুঠো আলগা করতে আর সঙ্গে সঙ্গে তির্যক একটা ছোবল পড়বে তার ওপর।

সময় যেন থেমে গেছে তখন! বুকের ওপর সাপের পাকটা কি শক্ত হয়ে উঠছে? নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতে শুরু হয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে তার বুকের বাঁধন আলগা হতে থাকে। উত্তেজিত ক্ষ্যাপার মত গোদাবর চিৎকার করে ওঠে দাঁত চেপে—উকু উকু উক্কু! সে জিতছে; শত্রুকে নিপাত করে আনলো সে। আর এক সময় তার দেহের বাঁধন আলগা হয়ে যায়। সাপটা নিঃসাড়ে ঝুলে পড়ে। ঘৃণাভরে মরা সাপটার দেহ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিজয়-ডাক ডেকে ওঠে গোদাবর—হু-উ-উক্কু! উকু উকু উক্কু উক্কু!

লঙ্গুরের দল গাছের মাথায় মাথায় কিচ্ কিচ্ করে লাফিয়ে লাফিয়ে তাদের আনন্দ জানায়। এক লাফে গোদাবর দলের মাথায় এসে উঠে একটা সাঙ্কেতিক ডাক ডেকে ওঠে। যাবার সময় এসে গেছে। আকাশে দেখা দিল ছেঁড়া ছেঁড়া তুলোট মেঘের দল। ঝুলতে ঝুলতে, দুলতে দুলতে শাখার পর শাখায় অদ্ভুত ক্ষিপ্র ভঙ্গীতে লঙ্গুরের দল মিলিয়ে যেতে থাকে।

উকু, উ-হুক্কু, উ-উক্কু! উক্কু উক্কু! বাতাসে কাঁপা কাঁপা তাদের যাত্রার আনন্দধ্বনি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসতে আসতে থেমে যায় এক সময়।

* * *

বছর ঘুরে চলে। দাবানল-পোড়া ময়ূরকণ্ঠী বন আবার সতেজ যৌবন নিয়ে জেগে উঠেছে। জলার জলে আবার নেমেছে জলচরেরা। মৃগ তার সম্বরের দল নিয়ে আবার ফিরে এল ময়ূরকণ্ঠী বনে। তার শিংগুলো এখন আরও লতিয়ে ডালপালা নিয়ে বিস্তৃত হয়ে গেছে, ঘাড়ের পেশীগুলো তার আরও সুদৃঢ় সবল, চোখে তার অভিজ্ঞ দলনায়কের দৃষ্টি। তার দল বেড়ে চলেছে। আরও গুটিকয়েক বাচ্ছা হয়েছে দলে। গুটিকয়েক বাচ্ছা শিঙাল-সম্বর হয়ে উঠতে চলেছে। তারা এখন মৃগর কাছাকাছি চলে। এই বন্য জীবনের অভিজ্ঞতা তাদের শিখিয়ে দেওয়ার ভার মৃগর। এমনি করেই ধাপের পর ধাপ এগিয়ে চলে জীবন। আর উচ্চৈঃশ্রবা—সে আজও অনুসরণ করে মৃগকে। উদ্ধত যৌবনের চাঞ্চল্য আজ কমে এসেছে মৃগর আর উচ্চৈঃশ্রবার। তার বদলে এসেছে স্থৈর্য।

আর রাজাও ফিরে এসেছে ময়ূরকণ্ঠী বনে। বাঘিনী তার দুই বাচ্ছা নিয়ে অন্য বনে সরে গেছে। বেরাল জাতের জানোয়ারদের নিয়ম ওই। তারা সপরিবারে কখনও বাস করে না। আজও রাজা সমস্ত প্রত্যঙ্গে পেশীর সাবলীল ঢেউ খেলিয়ে মন্থর গতিতে ঘুরে

বেড়ায়। চাঁদিনী রাতে নীলগাইয়ের জেব্রার পেছনে তাড়া করে ছুটে চলে সে। মৃগর দলের হরিণগুলোর ওপর আজও তার বেজায় লোভ। কিন্তু অভিজ্ঞ দলপতি মৃগ চিরদিনই তাকে ফাঁকি দিয়ে এসেছে।

জলা ছাড়িয়ে মেঘের পটে পাহাড়ের দল নিথর। দেবদারু বনের ভেতর দিয়ে ফ্যাকাশে চাঁদকে সুদূর, ভুতুড়ে বলে মনে হয়। পাতার রাশির মধ্যে দিয়ে শনশন করে বাতাসের চলাচল যেন জীবন্ত বনভূমির একটা দীর্ঘশ্বাস। তে-রঙা তিতিরের ডাকে থেকে-থেকে ঘুমন্ত বন সচকিত হয়ে ওঠে।

চোতের শেষে সেবার কেমন করে গুটিকতক গয়াল পাহাড়ের ওপরের জঙ্গল থেকে ছটকে এসে ময়ূরকণ্ঠী বনে নামল। গয়ালেরা একরকম বুনো মহিষ। কুচকুচে কালো বিশাল তাদের দেহ, যেন এক-একটা আবলুস-কালো হাতী। এদের মাথার শিং গোল, ঈষৎ বেঁকে মাথার ওপর উঁচু দাঁড়িয়ে থাকে। গয়ালদের অনেকটা ভারতীয় বাইসন বলা যেতে পারে।

আর সেই গয়াল দলপতিকে দেখলে একটা সম্ভ্রমের উদয় হবে। তার বুক আর কাঁধ একসঙ্গে লেগে যেন একটা বিশাল জমা শক্তি, চোখে তার এক বন্য মত্ত দীপ্তি! জলার একপাশে, যেখানে কাদার প্রাচুর্য বেশি, সেই দিকটায় আড্ডা করল গয়ালেরা। এদিকে সেই গয়ালের দলের জন্যে রাজার হল মুস্কিল। কতদিন তাদের পাগলা দৌড়ের জন্যে রাজার মুখের গ্রাস ছটকে গেছে। বনে তার দোর্দণ্ড প্রতাপ আজ প্রতিহত। আর ওই গয়ালের দলের একটা বাচ্চা যেদিন ছটকে রাজার পেটে গেল সেদিন থেকে ওই বাঘের জান নেবে প্রতিজ্ঞা করেছে গয়াল দলপতি। রাজারও তা অজানা ছিল না। গয়াল দলপতিকে কোনমতে সাবাড় করতে না পারলে এ বনে তার ওই শিকার শেষ। দু চারবার তারা মুখোমুখি যে পড়েনি তা নয়।

রাজা নিচু হয়ে পেশীগুলো টান করে হুঙ্কার ছেড়েছে আর গয়াল দলপতি কাঁধের পেশীগুলো ফুলিয়ে নিচু করে মন্তের মত মাথা নেড়েছে। নাক দিয়ে তার রাগ ঝড় হয়ে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু তখনও সময় আসেনি বল-পরীক্ষার। কিছুক্ষণ তাল ঠুকে আস্তে আস্তে সরে পড়েছে দুজনেই।

আর একবার—তখন বেলা দুপুর। জলার ওপর বিগড়ি হাঁসের দল ময়ূরপঙ্খীর সারের মত ভেসে চলেছে, পেছনে তাদের জল শিরশির করে কাঁপছে। গয়ালের দল দূরে বসে জাবর কাটছে। দলপতি খাওয়া শেষ করে সবে জলে মুখ দিয়েছে, হঠাৎ মাথার ওপর গাছের ডালে সামান্য সর্ সর্ শব্দ। না, বাতাস তো নয়! দলপতি চমকে চকিতে সরে সাবধানী ডাক ডেকে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে তীব্র হুঙ্কার করে রাজা গাছের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়েছে। সেই হুঙ্কারে হাঁসেদের ময়ূরপঙ্খী সার ভেঙে গেল। জলের ওপর ডানা ঝাপটে তারা তোলপাড় করে তুলল জল। কিন্তু বিফল বাঘ কি আর সেখানে দাঁড়ায়? রাগে গজরাতে গজরাতে সে ততক্ষণে হাওয়া।

এসব ভোলেনি গয়াল দলপতি। অপেক্ষা করে আছে একটা চরম সুযোগের, যখন সে ওই হতভাগা বাঘকে শিঙের নিচে রেখে থেঁতলে পিষে দেবে।

গয়ালের দল সেদিন বাদায় গা ডুবিয়ে পড়ে ছিল, শুধু দলপতি পাড়ে বসে শরীর এলিয়ে দিয়েছে। শোনা যায়না অথচ বোঝা যায়—একটা জীবনের স্পন্দন সমস্ত বনে পরিব্যাপ্ত। থেকে থেকে এক-একটা বন্য ভুতুড়ে আওয়াজ বনের সবুজ স্তব্ধতা ভেঙে ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ গয়াল দলপতির কান দুটো সজাগ, খাড়া হয়ে উঠল! একটা ভীত পালানোর শব্দ না? সে দেখল, একটা ছোট কালো রেখা লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছে। ক্রমে রেখাটা বড় হতে বোঝা গেল, সেটা একটা ভীত হরিণ-ছানা। গয়াল

দলপতি তার আগেই তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ সে জানে, হরিণছানাটা পথ ভুল করেছে। এপথে যায়নি হরিণের দল। পাগলা মোষেদের সব জানোয়ারই এড়িয়ে চলে। নেহাৎ ভয় না পেলে হরিণছানাটা দল থেকে ছটকে এপথে আসেনি। কাজেই ওর পেছনে কে তাড়া করে আসছে এটা গয়াল দলপতির অজানা ছিল না।

হরিণ-ছানাটা ছটকে বেরিয়ে চলে গেল। গয়াল দলপতি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে। কাঁধের পেশীগুলো তার থোকা, থোকা ফুলে উঠেছে। আর ঠিক সেই সময় গর্জন গাছটার আড়ালে রাজার শিকারী মুখখানা দেখা গেল। মুখের গ্রাস তার আবার ফসকে গেল। সামনে পথ রোধ করে শত্রু। রাগে রাজার চোখ-দুটো জ্বলে উঠল। এখন তার ঠোঁট গেছে গুটিয়ে, তীক্ষ্ণ বড় বড় দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে, কানদুটো পেছন দিকে চ্যাপটা হয়ে মাথার সঙ্গে লেপটে গেছে আর লেজটা চাবুকের মত এপাশ ওপাশ করে দুলছে। শরীর ধনুকের মত বেঁকে সটান। একটা ক্রুর হুঙ্কার ছাড়ল সে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধনুক-থেকে-ছাড়া তীরের মত মহিষের কাঁধ লক্ষ্য করে লাফ দিল।

গয়াল দলপতিও এবার তৈরি ছিল। এবার এসেছে সময়। বাঘের একটা প্রচণ্ড থাবা পড়েছে তার কাঁধে। প্রবল ঝাঁকুনি দিল সে তার কাঁধের পেশীগুলোয়। দূরে ছিটকে পড়ল রাজা আর একটা পাগলা ইঞ্জিনের গতিতে সে শিং দিয়ে মাটিতে গেঁথে ধরল রাজাকে। সম্মিলিত কয়েকটা গর্জনে বন কেঁপে উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে নিমেষে নীল আকাশ ভরে গেল শকুনের দলে। দুই শত্রুর আজ মরণ-বাঁচনের পরীক্ষা। প্রাণপণে শরীরের পেশীগুলো কিলবিলিয়ে মুক্তির চেষ্টায় অকৃতকার্য হয়ে রাজা অন্ধের মত থাবা চালিয়ে যেতে লাগল। নিশ্বাস তার প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। আর মহিষের মাথা

বেয়ে টস্‌ টস্‌ করে কাঁচা রক্ত প্রায় তার চোখ অন্ধ করে ফেলল। মিলিত গর্জন ক্রমশ বিকৃত গোঙানিতে নেমে আসতে লাগল।

হঠাৎ বন কাঁপিয়ে ও কী শব্দ? বাজ? আকাশে তো মেঘ নেই! বাঘের উদ্যত থাবা থেমে গেল, মহিষ আলগা করে দিল তার মাথার

চাপ। পিছলে বেরিয়ে এসে রাজা থমকে দাঁড়ালো। বাতাসে কিসের গন্ধ? দুপেয়ে মানুষের না? আর সেই ধ্বংসকারী বাজনলা বন্দুকের আওয়াজ না? এসেছে তৃতীয় শত্রু, বনে যার অধিকার নেই। তাদের সাম্রাজ্যে, তাদের দ্বন্দ্ব-কোলাহল-ভরা মন্থরতাময় বিশ্রান্ত সাম্রাজ্যে এসেছে এমন শত্রু, যাকে তারা কেউ চায় না।

এত যুক্তি দিয়ে রাজা আর গয়াল দলপতি তলিয়ে ভেবে দেখেনি। কিন্তু কোন এক অনুভূতির বলে, রক্তমাখা দেহে তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সমস্ত জঙ্গলের উদ্দেশে সাবধানী ডাক ডেকে উঠল। দেখতে দেখতে আকাশ ফাঁকা হয়ে গেল। নির্জন জলা নিথর। আর সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে ভেঙে রাজা আর গয়াল দলপতি সাবধানী ডাক ডাকতে ডাকতে পাশাপাশি দুই বন্ধুর মত নিবিড়—নিবিড়তর জঙ্গলে ঢুকে যেতে লাগল।

ছয়

লালসিং পাকা শিকারী। তার দীর্ঘ জীবনের অনেকটা সময়ই কেটেছে বনে বনে। রোদে পুড়ে জলে ভিজে তার শরীর কঠিন হয়ে উঠেছে। মাথার পাগড়ির পাশ দিয়ে রগের ধারের চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা। বাঁ হাতের বাহুতে তার কয়েকটা দীর্ঘ ক্ষত আজও বাঘের নখের চিহ্ন বহন করে। কিন্তু বন্দুকের হাত তার আজও স্থির, লক্ষ্য সুনিশ্চিত। শিকার তার নেশা, আর বনভূমির বন্য মায়া ভুলিয়েছে তাকে। সেই শিকারের পদচিহ্ন অনুসরণ করে শান্ত অথচ উত্তেজনাময় জগতে নিজেকে হারিয়ে ফেলা, আর উপভোগ করা প্রকৃতির ভাণ্ডারের সেই অজস্র ঐশ্বর্য! মুহুর্মুহু পট-পরিবর্তন! এই রক্তপলাশের বনে উদাত্ত লালের উদাসীন গরিমা, এই ধূম্রাভ পাহাড়ের মাথায় নীলের নীলিমা। হঠাৎ বনের সবুজে জেগে-ওঠা সাদা ফুলের অজস্র তারা-কুচি। কী তার সুবাস! আর বনের ওপর ঋতুর কী অপূর্ব প্রভাব! গ্রীষ্ম-দুপুরের সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিবর্ষী তাম্রাভ মূর্তি। বর্ষার সজল ছন্দোময় নৃত্য। শীতের উদাসীন গেরুয়া রূপ আর বসন্তের কোমল সবুজ নবযৌবন। লালসিং তাই ফিরে ফিরে আসে বন থেকে বনে। পিঠে তার একটা সাদানলা বন্দুক, হাতে একটা। বুকে ম্যাগাজিনের বেল্ট, পায়ে বুটের উপর ফেট্টি আঁটা।

হরিণ-শিকারের দিকেই লালসিংএর ঝোঁক বেশি, কারণ শিকারীর

জীবনে পায়ে হেঁটে হরিণ-শিকারের মত এমন অপূর্ব উত্তেজনা আর নেই বললেই চলে। নিপুণ শিকারী না হলে পায়ে হেঁটে হরিণের পদচিহ্ন অনুসরণ করে শিকার করা মোটেই সহজ কাজ নয়। আর সহজ নয় বলেই সেদিকে ঝোঁক লালসিংএর। অকারণ হত্যা করায় লালসিংএর প্রবৃত্তি নেই। সে চায় বুদ্ধি দিয়েই বনের বুদ্ধিমান পশুকে হারাতে। হয়ত বা বনের মধ্যে এক জায়গায় হরিণের সদ্য পদচিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল। সে চলল নিঃশব্দে অনুসরণ করে সেই পদচিহ্ন। যেতে-যেতে মাঝে মাঝে সে চিহ্ন অস্পষ্ট হয়ে হারিয়ে যেতে লাগল। অনেকটা ঘুরে বেড়িয়ে অনুসন্ধান করে আবার সেই চিহ্ন আবিষ্কার করে চলা। হয়ত বা সেই চিহ্ন অন্য কোনো হরিণের দলের পায়ের চিহ্নের সঙ্গে মিশে আবার আলাদা হয়ে দেখা দিল। এইরকম সাবধানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে হয়ত হরিণের দেখা মিলল, হয়ত বা মিললই না। হয়ত বা দেখা মিললেও সামান্য অসতর্কতায় শিকার মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল। এ যেন বুদ্ধির লড়াই। তার ওপর বনে অন্য জানোয়ারের ভয় আছে, আছে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে দিকভুল হয়ে যাওয়ার ভয়। কিন্তু এ সবে আজ লালসিং অপূর্ব দক্ষ। আর যেদিন থেকে ময়ূরকণ্ঠী বনে সে মৃগর সেই অপূর্ব শিঙাল মাথাটা দেখল সেদিন থেকে লালসিং যেন পাগল হয়ে গেল।

ময়ূরকণ্ঠী বনের কোলে খড়িয়াদের গাঁয়ে এসেই লালসিং শুনেছিল যে এবার বনে একটা সম্বরের দল নেমেছে আর সেই দলে আছে একটা আশ্চর্য শিঙাল হরিণ। হরিণটা যাদু জানে। অনেক চেষ্টা করেও খড়িয়ারা তাকে তীরের পাল্লায় আনতে পারে নি। এই দেখা গেল হরিণের দলটা নিশ্চিন্তে খেতে ব্যস্ত, খড়িয়ারা নিঃশব্দে জঙ্গলে মিশে মিশে অল্প কাছে গিয়েই দেখে হরিণের দলটা হাওয়ায় উবে গেছে। কতবার, কতবার ঘটেছে এই একই ব্যাপার! সেই

থেকে খড়িয়ারা মেনে নিয়েছে যে ওদের দলপতি ওই শিঙাল, বিশাল হরিণটা যাদু জানে। খড়িয়ারা একরকম জঙ্গলের মানুষ। জঙ্গল থেকে মধু, মোম, ধুনো, ময়না টিয়া বা চন্দনা পাখির বাচ্চা এবং বনের শটি বা পালো ইত্যাদি জোগাড় করে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করাই এদের প্রধান উপজীবিকা।

লালসিং খড়িয়াদের কাছে ওই শিঙাল হরিণটার কথা শুনে প্রথমে উৎসাহিত হয়েছিল, তারপরে হেসেছিল অবিশ্বাসের হাসি। দেখা যাবে বন্দুকের পাল্লার মুখে হরিণের কতখানি যাদু। খড়িয়াদের গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে, জঙ্গলের কোলে এসে তার তাঁবু ফেলল লালসিং। কয়েকজন খড়িয়া তার অনুচর। বনের পাখি শিকার করে কাটল কয়েকদিন। তারই বন্দুকের গর্জন শুনেছিল একদিন রাজা আর গয়াল দলপতি।

আর একদিন, সূর্য তখন পাটে বসেছে, আকাশের রঙে আর রক্তপলাশের ফুলে মিশে মিশে একাকার। যেন সমস্ত জগতে হোমাগ্নির রক্তশিখা জ্বলে উঠেছে। ঠিক সেই সময় গাছের দলের ভেতর দিয়ে, একটা ছোট টিলার মাথায় আকাশের পটে আঁকা মৃগর শিঙাল মাথাখানা দেখতে পেল লালসিং। লালসিং বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেল। এমন হরিণ সে জীবনে দেখেনি। ওই মাথাটা তার চাই-ই চাই। আমিরপুরের মহারাজার কাছে ওটা চড়া দামেই বিকোবে।

পরদিন সকালে উঠে তৈরি হয়ে নিল লালসিং। কাঁধ থেকে তার একটা ছোট ব্যাগ ঝোলানো, বুকে ম্যাগাজিনের বেল্ট আঁটা, পিঠে একটা বন্দুক আর হাতে একটা। আগের দিনের দেখা টিলাটার ওপর এসে হরিণের দলটার পায়ের চিহ্ন খুঁজে নিতে তার দেরি হল না। অনেকগুলো ক্ষুরের চিহ্ন চলে গেছে উত্তরমুখো।

*　　*　　*　　*

বাতাসে একটা অজানা গন্ধ মৃগর নাক এড়ায় নি। যদিও বন্দুকধারী মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় এর আগে ঘটে নি, কিন্তু সে লক্ষ্য করেছে যে ওই দুপেয়ে জানোয়ারটার গন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই বা ঈষৎ পরেই ভেসে আসে একটা পোড়া পোড়া বারুদের অদ্ভুত গন্ধ, অকস্মাৎ বনের মধ্যে ওঠে কয়েকটা মৃত্যু-কাতর চিৎকার। তাই অনুভূতির বলেই বুঝে নিয়েছে মৃগ যে ওই মানুষটাকে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। বাতাসে নাক তুলে কয়েকবার ঘ্রাণ নেয় মৃগ, তারপরে নিচু একটা সাবধানী ডাক ডেকে ওঠে—পেছনে একটা অজানা জানোয়ার! সম্ভরেরা সাবধান! এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো!

বন ঘন থেকে ঘনতর। চড়াই চলেছে। হরিণের দলের পদচিহ্ন ঘাসের ওপর দিয়ে, তৃণ-গুল্মের ওপর দিয়ে উত্তরমুখো ওপরে উঠেই চলেছে। লালসিংও নাছোড়বান্দা। প্রভাতের ঝলমলানো সূর্য ক্রমশ তীব্রতর হয়ে ঝলসে উঠছে। হরিণের দলটা কি থামবে না? জিরোবে না? আরও খানিকটা উঠে হঠাৎ লালসিং দেখল, হরিণদের পায়ের চিহ্ন আর নেই, হঠাৎ যেন উবে গেছে। জায়গাটা ঘন বনে ঢাকা, শাল আসান আর অন্য গাছের দল যেন কাঁধে কাঁধ দিয়ে আকাশে ঠেলে উঠেছে। লালসিং নির্বাক! এ কি ভোজবাজি? এর আগেও মাঝে মাঝে সে পেছু-নেওয়া হরিণের দলের পদচিহ্ন হারিয়ে ফেলেছে বটে, কিন্তু সে হয়েছে পাথুরে জমিতে, যেখানে পায়ের দাগ পড়ে না কিংবা অল্প-জল-বয়ে-যাওয়া নালার মধ্যে দিয়ে যখন হরিণেরা ফাঁকি দেয়। কিন্তু এ যে একেবারে সরস বনের মাঝখানে হরিণটার দল উবে গেল!

উপায় নেই। শিকারী-জীবনে নিরাশা মেনে নিতে হয়। ক্ষিধেটা চনচনে হয়ে উঠেছে। পিঠের ব্যাগ থেকে কয়েকটা রুটি

বার করে একটা গাছতলায় বসে পড়ে লালসিং। কিন্তু শুধু দু-টুকরো রুটি চিবিয়ে দুপুরের খিদে কি যায়? উত্তেজনায় পড়ে অনেক দূরে এসে পড়েছে লালসিং, এখন ফিরে যেতে বিকেল হয়ে যাবে। ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা জল খেয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে লালসিং। বনতিতির না? চট্ করে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে ঘোড়া টিপে দেয় সে। আর বন্দুকের আওয়াজটা গর্জে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লালসিং সবিস্ময়ে দেখে, ঠিক তার চারপাশ থেকে অনেকগুলো সম্বর হরিণ তীরবেগে পালাতে শুরু করেছে।

আরে, আরে! মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় লালসিংএর। সম্বরের দলটার ঠিক মাঝখানেই সে বসে ছিল! তাকে ঘিরে ঝোপে ঝাড়ে গাছের দলে মিশে নিঃশব্দে গা-ঢাকা দিয়েছিল হরিণের দলটা! দলের পেছনে বিদ্যুতের মত ছুটন্ত মৃগর শিঙাল মাথাটার পানে তাকিয়ে অবাক হয়ে বন্দুকটা পর্যন্ত তুলতে ভুলে যায় লালসিং।

বনতিতিরটা পড়েছে। শুকনো কাঠকুটো জোগাড় করে আগুন জ্বালে লালসিং, তারপরে আগুনের ওপর তিতিরটাকে ঝলসাতে থাকে। বন্য পৃথিবীতে অদ্ভুত স্তব্ধতা। বনে তখন দুপুরের বিশ্রাম। একটা পাখির ডাকও নেই। সেই অদ্ভুত স্তব্ধতায় মনে হয় সমস্ত বন যেন গমগম করছে। গাছেরা নিঃশব্দে কথা-বলাবলি করতে থাকে। একটা বুনো গাছে বড় বড় বকফুল ফুটে আছে। ওপাশের পাহাড়ের মাথায় একটুকরো মেঘ সবুজ ছায়া ফেলেছে। পাহাড়টার আমলকি-ঘেরা সবুজ গা-টা কোথাও ছায়াঘন, কোথাও ঝিমঝিমে রোদের সতরঞ্চ কাটা!

খাওয়া শেষ করে গাছতলায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বসেছিল লালসিং। আজ আর হরিণের দলটার পেছনে অনুসরণ করে লাভ নেই। এমনিতেই গাঁয়ে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। হঠাৎ তার নজরে পড়ল, একটা বড় সাপ দুটো পাঁশুটে খরগোসকে তাড়া করেছে।

বন্দুকটা তুলে সাপের মাথাটা লক্ষ্য করে তাক করতে যাচ্ছিল লালসিং। কিন্তু তার মনে হল, শিকারী জানোয়ারের খাদ্য-সংগ্রহে সে বাধা দেবে কেন ? দেখাই যাক না। সাপটা খরগোস-ছুটোর কোন্‌টাকে তাড়া করছিল বোঝা যাচ্ছিল না, কারণ সে দেখল দুটো খরগোসই একসঙ্গে একদিকে ছুটছে আর কিলবিলে সাপটাও তীব্র গতিতে তাদের পেছু নিয়েছে।

কিছু দূরেই মাটিতে খরগোসদের গর্ত। খরগোসরা বনের নিরীহ জীব। শত্রুর শেষ নেই তাদের। তাই তাদের মাটির ভেতরের বাসাগুলোর দুটো করে গর্ত থাকে। একটা গর্ত দিয়ে ঢুকে আর-একটা গর্ত দিয়ে তারা বেরিয়ে যেতে পারে।

লালসিং দেখল খরগোস-দুটো তাদের আড্ডায় এসে একটা গর্তের ভেতর ঢুকে পড়ল আর পরমুহূর্তে সাপটাও ঢুকে গেল সেই গর্তে। অল্পক্ষণ পরে একটু দূরের একটা গর্ত থেকে বেরিয়ে এল খরগোস-দুটো। তারপরে আশ্চর্য হয়ে লালসিং দেখল যে খরগোস-দুটো পালালো না। একটা খরগোস প্রাণপণে মাটি খুঁড়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে গর্তের মুখটা বোজাতে লাগল আর দ্বিতীয় খরগোসটাও ঘুরে এসে যে-মুখে তারা ঢুকেছিল সেই মুখটাও বোজাতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে গর্তের দুটো মুখই বন্ধ হয়ে গেল এবং গর্তের মুখে মাটির ঢিপি হয়ে উঠল। খরগোস-দুটো সেই ঢিপিগুলোর ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে চেপে জমাট করে দিল, তারপরে পাশাপাশি লাফাতে লাফাতে ঘাসের ভেতর মিলিয়ে গেল। ঠিক যেন তারা কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে বলতে বলতে গেল—কেমন যাদু, আর আসবে খরগোসদের পেছনে তেড়ে ?

লালসিং হেসে ওঠে আপন মনে।

বন্য জীবনে বুদ্ধির প্রকাশ কত আশ্চর্যরকম ভাবে প্রকাশ পায় ! বন্য প্রাণীদের এই বুদ্ধির প্রকাশকে জঙ্গলের সরল মানুষেরা বলে

যাতু জানা। ধরা যাক না, লালসিং ভাবছিল, ওই হরিণ দলটার বুদ্ধি। শত্রু যখন নির্মম ভাবে অনুসরণ করে আসছে, কত আর পালানো যাবে? খাওয়া দাওয়া, জীবন ধারণের সমস্যা তো আছেই, তার চেয়েও বড় একটা প্রবৃত্তি আছে বোধহয় শত্রুকে বুদ্ধির লড়াইতে হারিয়ে দেওয়া। তাই ছুটতে ছুটতে হঠাৎ নিশ্চিন্ত হয়ে নিঃশব্দে মাঝখানে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়াও তারই একটা প্রকাশ। শত্রু এগিয়ে যাবে খুঁজতে খুঁজতে, দল তখন উল্টোমুখো।

এইরকম একবার বন্য জীবের বুদ্ধিতেই তার দারুণ তৃষ্ণার সময় তৃষ্ণা মেটাতে পেরেছিল সে। সে কথা মনে পড়ে যায়।

তখন গ্রীষ্মকাল। আকাশ পোড়া, তামাটে। সারাদিন বনে বনে ঘুরে তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। সঙ্গের ফ্লাস্কের জল কখন শেষ হয়ে গেছে। ক্যাম্প বহু দূরে। বন ছাড়িয়ে জলের সন্ধানে সে অনেক দূর এসে পড়েছিল। সেদিকটা ফাঁকা, বালিভরা মরুভূমির মত। খুঁজতে খুঁজতে একটু জলের সন্ধান সে পেয়েছিল। দূরে একটুখানি স্বচ্ছ জল চিক-চিক করছে আর তার চারপাশে ধূ-ধূ নরম সাদা বালি ঈষৎ ভিজে-ভিজে। ব্যগ্র হয়ে সে জলের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। বোধহয় তৃষ্ণার তাড়নায় তার শিকারী চোখে অনেক আগেই যা পড়া উচিত ছিল তা এড়িয়ে গিয়েছিল। জলাটা একটা বুনো প্রাকৃতিক ছোট হ্রদই হবে বোধহয়। তরু-গুল্মহীন হয়ে দিনের পর দিন সূর্যতাপে মজে আসছিল। কিন্তু যে ঘটনা সে লক্ষ্য করেনি তখন তা হল, জলায় নেই পাখিরা, নেই কোনো প্রাণের প্রাচুর্য।

কিন্তু তখন বুকে নিদারুণ তৃষ্ণা আর সামনে বালির ওপর চিকচিকে স্বচ্ছ জল। সামনে এগিয়ে যেতেই বুট-সুদ্ধ পা বালির ভেতর বসে গেল। পা-টা তুলে নিয়ে আর-এক জায়গায় পা দিতেই আরও বসে গেল, এবারে প্রায় হাঁটু অবধি। সভয়ে সে পেছিয়ে

এল। বুদ্ধি ফিরে এসেছে তখন। চারপাশে হ্রদটা ঘিরে নরম চোরা-বালি। ফিরে এসে একটা ঢিপির ছায়ায় বসে সে হাঁফাচ্ছিল, হঠাৎ দূরে খস্ খস্ শব্দ শুনে সে চমকে উঠেছিল। বালির ওপর দিয়ে একটা বুনো ঘোড়া জলের দিকে এগিয়ে চলেছে!

ঘোড়াটা কি জানে না সেটা চোরা-বালির জায়গা? বেশ সাবধানে এগিয়ে যাচ্ছিল ঘোড়াটা আর প্রতি পদক্ষেপেই তার পা আরও একটু বেশি বসে যাচ্ছিল। তেষ্টার জন্যে কি প্রাণ দেবে ঘোড়াটা? না, ঘোড়াটা একেবারে বোকা নয়। হাঁটু অবধি পা যেখানে বসে গেল সেখান অবধি গিয়ে ঘোড়াটা ফিরে এল। সে ভেবেছিল, যাক, তৃষ্ণার সাথী হল একজন। ঘোড়াটা কিন্তু একেবারে ফিরে গেল না। খানিকটা এসে রোদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে লেজ তুলিয়ে তুলিয়ে বুনো মাছি তাড়াতে লাগল।

একটু পরে সে দেখে, ঘোড়াটা আবার এগিয়ে চলেছে ঠিক তার আগের বারের পায়ের গর্তগুলোর পাশ দিয়ে। তারপরে সে দেখেছিল ঘোড়াটা খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তার আগের বারের পায়ের চাপা গর্তগুলো থেকে নিশ্চিন্ত আরামে জল খাচ্ছে। জলের কাছাকাছি বালিতে, যেখানে তার পা হাঁটু অবধি বসে গিয়েছিল, সেই গর্তগুলো কিছুক্ষণ পরেই নিচে থেকে ছাঁকা জলে ভরে উঠেছিল।

একটা বুনো ঘোড়ার বুদ্ধি অনুকরণ করে সেও সেদিন জল খেতে পেরেছিল।

আর একবার বাংলাদেশে সুন্দরবনের এক জমিদার-বাড়িতে মাছ শিকারের কথা মনে পড়ে যায় লালসিংএর। জমিদারবাবুর শম্ভুনাথকে শিকার করতে পারেনি সে। শম্ভুনাথ হল একটা কাৎলা মাছ। মাছ তো আর বন্দুক ধরে শিকার করা যায় না! জমিদার-বন্ধুর দিঘিটা ছিল যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি স্বচ্ছ টলটলে তার জল। কোকিল-ডাকা স্তব্ধ দুপুরে দিঘিতে ছিপ ফেলে, অসীম

ধৈর্য ধরে, না-দেখা না-চেনা জলের তলার কোনো রহস্যময় শিকারের আশায় বসে থাকা বনের কেঁদো বাঘ শিকারের চেয়ে কম উত্তেজনা আনে না মনে। আর দিঘির জলে জল-ফড়িংএর মত ফাৎনাটা কাঁপে, জলে ছায়া পড়ে। তুলোট মেঘের সাদা-সাদা শালুক ফুল হলুদবরণ কোরকের আভা দেখিয়ে মৃদু মৃদু দোলে। হঠাৎ ফাৎনাটা ডুবে যায়। এক টান। বুকের রক্তও যেন উত্তেজনায় লাফিয়ে ওঠে! হুইল বেজে ওঠে. বোঝা যায় নীলচে কালো জলের নিচে দিয়ে ক্ষ্যাপা একটা না-দেখা, না-চেনা শিকার ছুটে চলেছে।

শম্ভুনাথ কিন্তু তার জমিদার-বন্ধুর না-দেখা না-চেনা ছিল না। জমিদার-বন্ধু তার ছিলেন পাকা মাছ-শিকারী। ছিপই ছিল তাঁর কত! কত রকমের হুইল, বঁড়শি আর রং-বেরঙের ফাৎনা! শম্ভুনাথের বয়স যখন কম ছিল তখন তাকে একবার ছিপে ধরেছিলেন তার জমিদার-বন্ধু। প্রায় দু-ঘণ্টা খেলিয়ে যখন তাকে ডাঙার কাছে গুটিয়ে আনা হল তখন তার সব দম শেষ হয়ে গিয়েছিল। বেশ দড়ি-বাঁধা পোষা কুকুরটির মত শম্ভুনাথ ডাঙার কাছে এগিয়ে এসেছিল। বড় কালো শরীরটা তার স্বচ্ছ জলের নিচে ফুটে উঠেছিল। হঠাৎ বড় এক হেঁচকা টান, আর ধনুকের মত শরীরটা দুমড়ে লাফ মারল শম্ভুনাথ। ছিপসুদ্ধ জমিদারমশাই জলে। সুতো ছিঁড়ে শম্ভুনাথ দিঘির কালো জলের কোন অতল তলে তলিয়ে গিয়েছিল। তারপর আর একবারও ছিপে ধরা যায়নি শম্ভুনাথকে।

সেবার সে, লালসিং, অনেকদিন কাটিয়েছিল সেই সুন্দরবনের জমিদার-বন্ধুর দেশে। অনেক বনে অনেক শিকার সে করেছে, জলরাজ্যের গভীর রহস্যময় বনে মাছ শিকারের নেশা যেন তাকে পেয়ে বসেছিল। বহুদিন শঙ্খচিল-ডাকা নীল দুপুরে নিস্তব্ধ দিঘির কালচে সবুজ গভীর নিচে থেকে এক-একটা হাওয়ার বুদ্বুদ ভেসে উঠে কাঁপতে কাঁপতে দিঘির জলে ফেটে ঢেউ হয়ে ছড়িয়ে গেছে।

জমিদার-বন্ধু বলে উঠেছেন, ঐ শম্ভুনাথ ফুট কাটছে! অবাক হয়ে চেয়ে থেকেছে সে দিনের পর দিন। দিঘির জল আরও কালো, আরও সবুজ হয়ে উঠেছে আর জলের ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকে ছায়াঘন, শীতলতর করে তুলেছে আম, কাঁটাল, জাম আর জামরুল গাছের দল। কয়েকটা ঝাউ গাছ তাদের ঝিরঝিরে পাতাবহুল ডালপালা মেলে নীল আকাশের দিকে আরও একটু উঁকি মেরেছে। শ্যামা, দোয়েল, ছাতারের দল আর মাছরাঙারা রঙে গানে মাতিয়ে তুলেছে দিঘির পাড়।

কতদিন শেষ রাতে বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে সে দিঘির পাড়ে বসেছে। শেষ রাতেই নাকি শম্ভুনাথ জলের ওপর উঠে আসত। মাছের চারের তীব্র মধুর গন্ধের সঙ্গে ভেসে আসত মালতী ফুলের ঝিমঝিমে সৌরভ। ঝাউগাছগুলোর মাথায় মরা সোনার জলে নাওয়া চাঁদ ডুবতে হেলে পড়ত। ঝাউয়ের পাতায় বাতাসের হঠাৎ-জাগা দীর্ঘশ্বাস আর দিঘির জলে ঢেউয়ের মৃদু নাচের তালে তালে চিকচিকে চাঁদের আলোয় ফাৎনাটা কাঁপত। সমুদ্দুরের মোহনায়, জোয়ারের অরণ্যের কোলে বাংলা দেশের সেই নরম সবুজ গাঙটা যেন কোন রহস্যময় ভিন্ন গ্রহের একটা টুকরো।

শম্ভুনাথকে কিন্তু ধরা যায় নি।

বাংলাদেশে পুজোর সময় বড় ধুমধাম। সেবার পুজোর সময় তার জমিদার-বন্ধু লোকজন ডেকে বলেছিলেন, এবার দিঘিতে বড় জাল দে! শম্ভুনাথকে এবার ওঠাতে হবে।

দিঘিতে বড় জাল পড়া—সে এক হৈ-হৈ ব্যাপার। এ-পাড় থেকে ও-পাড় একটা প্রকাণ্ড জাল, দলে দলে জেলেরা জালের দু-মাথা জলে ডুবিয়ে দিয়ে আর দু-মাথা ধরে টানতে টানতে দিঘি ছেঁকে এগিয়ে যায়। কত মাছ কিলবিল করে ভেসে ওঠে। জালের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলে তারা, ওপাড়ে জাল পৌঁছলেই বন্দী। সেদিন

ভোরের বোধনের সানাই ইনিয়ে বিনিয়ে প্রভাতী গেয়ে যাচ্ছিল আর ঢাকে যেন উঠছিল মেঘের ঘন রোল। জাল দিঘির মাঝ-বরাবর পৌঁছতেই হু-উ-স করে জলে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন।

পাড়ে জমায়েত অনেক লোকের হৈ-হৈ শোনা গিয়েছিল— শম্ভুনাথ! শম্ভুনাথ!

সেই দেখেছিল সে শম্ভুনাথকে। প্রকাণ্ড মাছটা কালো, কিন্তু সাবলীল। মাছের দলের আগে আগে জালের সঙ্গে মন্থর অথচ ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে দিঘির ওপাড়ে। এইবার বন্দী শম্ভুনাথ। মনটা যেন তার খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এমন করে ওই বেড়াজালে খেলোয়াড় মাছটাকে শিকার করা হবে?

জমিদার-বন্ধু হাঁক দিয়েছিলেন, সাবধানে তুলবি মাছটাকে, যেন জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে না যায়! ভারি জোর মাছটার!

না কর্তা, জেলেরা বলেছিল, এ জাল ছেঁড়ার নয়, হাতী বাঁধা যায় এ জালে।

তখন জেলেরা দিঘির ওপাড়ে পৌঁছে গেছে। জালের মাথা ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনা হচ্ছিল। হঠাৎ সে ভয়ানক অবাক হয়ে দেখেছিল, শম্ভুনাথ তীব্রগতিতে পাড়ের দিকে এগিয়ে গিয়েই বাঁক নিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড লাফ। চারদিকে হৈ হৈ চিৎকার। শম্ভুনাথ তখন জাল ডিঙিয়ে গভীর জলে ডুব মেরেছে। জলসিক্ত বিরাট দেহটা তার আকাশের শূন্যে এক মুহূর্তের জন্যে সূর্যালোকে ঝলসে উঠেছিল। পাকা শিকারী লালসিং; তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, সাবাস! সাবাস!

জাল গুটিয়ে আনার শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও মাছটা একবারও জানতে দেয়নি যে সে তার বিপদের কথা জানত বা কী করে পালাতে হবে তাও ভেবে রেখেছিল।

পুরোনো স্মৃতিকথা ভাবতে-ভাবতে কোথায় যেন চলে যেতে

হয়। কিন্তু মাথার ওপর একদল বকের পত্‌ পত্‌ পাখায় বর্তমানে ফিরে এল লালসিং। উঠে পড়ে ব্যাগটা আবার পিঠে বেঁধে নিল, বাগিয়ে নিল বন্দুক, তারপরে দীর্ঘ মন্থর পা চালিয়ে দিল খড়িয়াদের গাঁয়ের দিকে।

*　　　*　　　*　　　*

লালসিং ভেবেছিল ময়ূরকণ্ঠী বনে সে অল্প কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাবে, কিন্তু মৃগকে দেখার পর থেকে তার সে মতলব বদলে ফেলতে হল। মৃগর মাথাটা তার চাইই চাই। কদিন মৃগর দলটার পেছু নিয়ে লালসিং বুঝেছে যে তাকে একটা বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ সম্বর দলপতির সঙ্গে যুঝতে হবে। কিছুদিনের মধ্যে লালসিং বুঝে নিয়েছে যে মৃগকে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আনা কত শক্ত, আর মৃগও দেখেছে যে ওই বাজনলা বন্দুক হাতে দুপেয়ে মানুষটাকে ফাঁকি দেওয়া যায় কিন্তু ঝেড়ে ফেলা যায় না। বার বার বহুবার সম্বরের দলটা ফাঁকি দিয়েছে লালসিংকে, কিন্তু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে লালসিং আবার খুঁজে বার করেছে মৃগর দলটাকে। কখনও নিচের বনে জলার পাড়ে, কখনও পাহাড়ের ওপরের বনে, ধাপে ধাপে, টিলায় টিলায়। তাঁবু নিয়ে দিনের পর দিন বনের ভেতর কাটিয়েছে সে। আশে-পাশেই শুনেছে নীলগাইয়ের জেব্রার দৌড়, লঙ্গুরদের খেয়াল-খোলা ডাক, করগড়িদের সম্মিলিত মাটি শোঁকার আওয়াজ, রাজার গুরুগম্ভীর গর্জন। ওপরের বন থেকে কোনো কালবৈশাখী দিনে সে শুনেছে এক দলহারা মত্ত হাতীর বন মথে-ফেলা ক্ষ্যাপা বৃংহিত। নিচের বন থেকে দেখেছে অস্তসূর্য আকাশের পটে সারি বেঁধে হাতীর দলের পাহাড়ে ওঠা। হরিণের দলটাকে সে চোখে-চোখে রেখেছে, কিন্তু কখনও বন্দুকের পাল্লার ভেতর আনতে পারেনি। এদিকে বনের কোনে পলাশের রাঙা রং ঘন থেকে ঘনতর হয়ে উঠেছে, থোকা-থোকা বনফুল সাদা রঙে ধাঁধিয়ে দিয়েছে বন-সূর্যকে। চাঁদে-পাওয়া বনে

বনে ভেসেছে জললিলির মৃদু সৌরভ, কেয়ার গন্ধে মাতাল হয়েছে বসন্ত-বাতাস।

লালসিং তাই পারেনি ময়ূরকণ্ঠী বন ছেড়ে যেতে। সারা জীবন যদি তাকে ওই হরিণটার পেছনে ছুটে বেড়াতে হয় তাহলেও সে

শুনেছে মত্ত হাতীর ক্ষ্যাপা বৃংহিত—৬৫

পেছোবে না। খড়িয়াদের গাঁয়ে তাই সে গড়েছে তার ঘর। একটা গাই জোগাড় করতে তার দেরি হয়নি; তারপরে পাতিহাঁস আর মুরগির পালের ঘর তৈরি করেছে। ময়ূরকণ্ঠী বনের ধারে রীতিমত সংসার পেতে বসেছে লালসিং।

একদিন খড়িয়াদের কাছে লালসিং শুনল, এবারে বনের জলায় একটা রাঙামুড়ি হাঁসের জেরা নেমেছে—এমন হাঁস জীবনে ওরা দেখেনি। লাল টুকটুকে তাদের মাথা থেকে ডানা, নীল চোখ, আর বুকের থেকে পুচ্ছ পর্যন্ত সাদা। ওই একটা হাঁস তাদের মেরে দিতে হবে, ওর পালক মেয়েরা খোঁপায় গুঁজবে।

লালসিং বলেছিল, আচ্ছা।

সাত

ভাল্লুক-মা তার দুই ছানা নিয়ে বেরিয়েছিল খাবারের সন্ধানে। দুটো বাচ্ছা যেন দুটো কালো-কালো লোমশ বল; ছটকে ছটকে এদিক ওদিক চলে যায়, আবার ছুটে ফিরে আসে মার কাছে। আকাশ পরিচ্ছন্ন নীল। বন সবুজে-সোনায় ঝিমঝিম। আকাশে ভেসে ভেসে ঘুরে ঘুরে চিলেরা শূন্যে ওঠে।

কির্‌কি-ই-কি কির কি ই!

ভাল্লুক-মা বলে, ওই শোন চিলেরা জানিয়ে দিচ্ছে যে ভাল্লুক শিকারে বেরিয়েছে।

ভাল্লুকের বাচ্ছাদুটো চুপ করে দাঁড়িয়ে চিলের ডাক চিনে নেয়।

ভাল্লুক-মা আবার বলে, যার চোখ আঁধারে জ্বলে, যার কানে বাতাস বয়ে আনে দূর জানোয়ারের খবর, যার নাকে ভেসে আসে শত্রুর ঘ্রাণ, সে-ই শুধু বনে শিকারের উপযুক্ত। চল বাছারা, অশ্বত্থ-ডালে মৌমাছিরা চাক বেঁধেছে. মৌ খাইগে চল!

পুব-দক্ষিণে পলাশের বন পিছে ফেলে অশ্বত্থডালে মস্ত মৌচাক। চাকের নিচে এসে ভাল্লুক-মা বলে, জানিস, বনে সবাইয়ের একটা বাঁধা জায়গা আছে যেখানে তারা চরে বেড়ায়। কোনো জানোয়ারের চরার জায়গায় এসে শিকার করতে হলে আগে হুকুম নিয়ে করতে হয়। এটা মৌমাছিদের ডেরা, তাই হুকুম নিয়ে নে।

—শোনো ভাই মৌমাছি, আমাদের বড্ড খিদে পেয়েছে,

তোমাদের চাকটা তাই ভাঙতে হবে। তোমাদের বড্ড রাগ হবে জানি, কিন্তু মৌ না খেলে যে আমাদের থাবায় বল হবে না! তাই তোমরা যত খুশি হুল ফুটিয়ে দিও আমাদের।

ভাল্লুক-মা চোখ ঠেরে বাচ্ছাদের বলে, আমাদের লোমের ওপর হুল ফুটিয়ে কী করবে মৌমাছিরা? শুধু দেখিস যেন নাকের ওপর না ফোটায়।

বলতে বলতে ভাল্লুক-মা গাছের ডালে উঠে প্রকাণ্ড চাকটায় থাবা দিয়ে মারে এক খোঁচা। চাকটায় একটা ফুটো হয়ে যায় আর চুঁইয়ে চুঁইয়ে টপ টপ করে মধু ঝরতে থাকে। ভাল্লুক তার বাচ্ছা-সমেত গাছের তলায় বসে চেটে চেটে সেই মধু খেতে থাকে,

আর একরাশ ক্রুদ্ধ মৌমাছি পর পর তাদের লোমে হুল ফুটিয়ে যেতে থাকে।

ভাল্লুকদের ভ্রূক্ষেপ নেই।

সন্ধ্যার অপরূপ আলো-আঁধারে বাদার ওপর শোনা যায়—হঁক্ হঁক্! হঁক্ হঁক্!

রাঙামুড়ি হাঁসেরা আসছে; আগে সর্দার, পেছনে দল;—ইস্ক্রুপের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নামতে থাকে। রাঙামুড়িরা যাযাবর হাঁস। এদের গতিপথ বিচিত্র, দিগন্ত-বিস্তারিত। গরমের সময় এরা থাকে উত্তর সাইবেরিয়ার বনে-বাদায়। আর শীতের মুখে মুখে যখন সাইবেরিয়া বরফে ঢেকে যেতে থাকে আর বরফের ওপর দেখা দেয় সাদা শেয়াল, রাঙামুড়িরা তখন সার বেঁধে আকাশে উঠে পড়ে। মেঘে মেঘে তাদের যাত্রাধ্বনি শোনা যায়, হঁক্ হঁক্! হঁক্ হঁক্! চল ভাই, চল দক্ষিণে, আরও দক্ষিণে, সোনার দেশ ভারতবর্ষে,—যেখানে ফোটে আপেল ফুল, কমলা-মধু দিয়ে মৌচাক গড়ে মৌমাছি; যেখানে নদীতে, জলায় চিকিমিকি মাছের ঝাঁক খেলা করে, যেখানকার শীত এখানকার গরমের মত। চল ভাই চল!

এই সময় রাঙামুড়িরা ছড়িয়ে পড়ে কাশ্মীর থেকে উত্তর প্রদেশ। দু-একটা দল ছটকে যে বিন্ধ্য পাহাড় পানেও চলে আসে না তা নয়।

রাঙামুড়ি হাঁসের দলটা যখন ঘুরে ঘুরে বাদার ওপর নামছে, হঠাৎ লালসিংএর বন্দুক গর্জে ওঠে। দুটো হাঁস চিৎকার করে দল থেকে ঝরে পড়ে আর চেঁচিয়ে ওঠে রাঙামুড়ির সর্দার, পঁয়াক! পালাও পালাও! ওঠো আকাশে! দুপেয়ে মানুষ!

তীর্যক বাঁক নেয় হাঁসের দল। বন্দুক গর্জে ওঠে আবার। একটা মৃত্যুকাতর চিৎকার করে উঠে ঘুরতে ঘুরতে বাদার জলে পড়ে যায়

রাঙামুড়ি সর্দার। রাতের কালো অন্ধকার তখন ঘনিয়ে আসছে এই বন্য পৃথিবীর ওপর।

গুলিটা বুকে লাগেনি রাঙামুড়ি সর্দারের ; একটা ডানার হাড় ভেঙে দিয়ে ঘেঁসে বেরিয়ে গিয়েছিল। বাদার জলে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল সে। জ্ঞান হতে সে দেখল, পৃথিবী অন্ধকার। দূরে জ্বলছে জোনাকির মালা। ঈষৎ যন্ত্রণায় এবং তার সঙ্গে পরিত্রাণের নিশ্চিন্ততায় কঁ-অ-ক করে একটা শব্দ করে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে সভয়ে সে দেখল, অন্ধকারের মধ্যে কি যেন একটা সাঁতরে আসছে তার দিকে। একটা বুনো শেয়াল না ? শিকারের সন্ধান পেয়েছে? টুপ করে ডুব মারল রাঙামুড়ি সর্দার, আর ডুব-সাঁতরে গিয়ে উঠল যেদিকটায় শরবন ঘন আর পাশে যার গভীর নরম কাদার বেড়া।

খড়িয়া মেয়েদের কষ্টি-কালো মরাল গলায় কড়িব মালা, মাথায় রাঙামুড়ি হাঁসের চকচকে লাল পালক। বনের ধারে গ্রামটা বেড়ে চলেছে। সময় এগিয়ে চলে আর প্রাণীদের বংশবৃদ্ধি হয়। মরণের হারের চেয়ে জন্মের হার বেশি, তাই বনজমি ছাড়ে ক্ষেতকে। সরষে ফুলের হলুদে হেসে ওঠে ক্ষেত। এদিকে লালসিংএর ডেরায় গাইএর বাচ্ছা হয়, মুরগি আর পাতিহাঁসের দল বাড়তে থাকে

এই পাতিহাঁসগুলোর মধ্যে একটা হংসী, ঠোঁটদুটো যার কমলা রঙের আর শরীরটা দুধের মত সাদা, সেটা ছিল বেজায় ছটফটে। কিছুতে দলে থাকবে না, খালি ছটকে ছটকে বনে পালিয়ে যাবে। সন্ধে থেকে সেটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। যাক, শেয়ালের পেটে যাক! নিক, শিক্‌রেয় নিক তাকে! যেমন দল-ছাড়া!

পাতি হংসীটা সত্যিই পালিয়েছিল। সারারাত সে বনের মধ্যে একটু চলেছে আর ডানার ভেতর ঠোঁট গুঁজে একপায়ে একটু ঘুমিয়ে নিয়েছে। ওই দূরে ভেসে আসছে না কাদামাটির জোলো-জোলো

সোঁদা-সোঁদা গন্ধ? ভোর রাত্রে উষা যখন পাটে বসে-বসে, হঠাৎ ঘুমভাঙা চোখের মত পুব আকাশে লালের ছিট, শরবনটা সরিয়েই বিস্ময়ে বিভোর হয়ে যায় হংসীটা। সামনেই প্রশস্ত জলা, আর সেই জলার কোলে কী অপূর্ব সুন্দর একটা হাঁস!

পেঁয়াক, পেঁয়াক!

রাঙামুড়ি সর্দার চমকে ওঠে। সে তখন কাদা তুলে ডানাটার ওপর লাগাচ্ছিল। চেঁচিয়ে ওঠে সে, প্যাঁক! পেঁয়াক! পালাও, পালাও! দুপেয়ে মানুষ!

হংসীটা বলে, পালাবো কেন?

পালাও! উড়ে যাও, ওঠো আকাশে! যার পাখায় গতি আছে, মেঘের ওপর যে ভাসতে পারে, সে-ই শুধু বনে বেঁচে থাকার যোগ্য।

হংসী অবাক হয়ে বলে, হাঁসেরা আবার ওড়ে নাকি? ওড়ে তো পাখিরা!

ওড়ে বৈকি! জবাব দেয় রাঙামুড়ি সর্দার, মেঘের মাথায় মাথায়, সাপের মত নদী রেখে পায়ের নিচে, পাহাড়ের কোল ঘেঁসে—দূর, দূর পৃথিবীতে উড়ে যায় হাঁসেরা।

তুমি উড়তে পার?

চুপ করে থাকে রাঙামুড়ি সর্দার।

হুঁ! তুমি দেখতে সুন্দর হলে হবে কী? বড় বাজে বকো! হাঁসেরা আবার ওড়ে! বলি, বাসা-টাসা বাঁধতে জানো, না কেবল উড়ে বেড়াও?

রাঙামুড়ি সর্দার সেই মাটির পাতিহাঁসটার সঙ্গে জলার ধারে জোড় বাঁধে!

দিন যায়। সরষে ফুলে ফল দানা বাঁধে। ডিম ফুটে রাঙামুড়ি সর্দারের বাচ্ছা হয় চারটে, মাথাটা লাল. আর দেহটা সাদা, ডানার কোলের হাড়গুলো সরু। রাঙামুড়ি সর্দার আকাশের পানে চেয়ে

দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ওরা দেখবে না আকাশের মায়া, যাযাবর পথ ডাক দেবে না ওদের। কিন্তু সুন্দর বাচ্ছাগুলো, আর শান্ত নিরুপদ্রব এই জীবন! কেন ছুটে চলা উত্তাল বাতাসের ঢেউয়ের মুখে-মুখে? সেরে-আসা ডানাটার রাঙা পালকের ভেতর ঠোঁট গুঁজে ঝিমোয় রাঙামুড়ি সর্দার।

বসন্ত কেটে যায়, গ্রীষ্ম আসে; রক্তে আসে জোয়ার, দক্ষিণ বাতাসের ঢেউ ডানায় ডানায় ঝলক তুলে যায়, কিন্তু তবু ডানা শক্তিহীন। আসে বর্ষা রিমি ঝিম, ঝিম ঝিম; গাছের পাতায় পাতায় মুক্তোর মালা নাচে আর নাচে। আসে শীত। চিকিমিকি মাছের দল বাদার জলে রুপোলি বিদ্যুৎ হেনে যায়। এই তো জীবন; তৃপ্ত, সমাহিত। পুরোনো গাছের দল বাকল ছাড়ে, নতুন গাছেরা আর-একটু মাথা তুলে দেয় সূর্যের পানে। রাজার হুঙ্কার আরও গমগমে, পূর্ণ, গম্ভীর হয়ে ওঠে। শেষ হল যৌবনের পূর্ণতা, বাচ্ছারা তার আজ সবল পেশীতে নিঃশব্দে বনে ঘোরে। দল-ছাড়া দুষ্টু হাতীটা আজও খুঁজে ফেরে দল। বুনো মোষের আসল দলটা আবার ফিরে গেছে তাদের পুরোনো বনে, কিন্তু তাদের ক-টা বাচ্ছা দল বেঁধেছে এই ময়ূরকণ্ঠী বনের জলার কোলে। তাদের দলপতির কাঁধের পেশীগুলোতে ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছে তেমনি সবল সক্ষমতা, পাঁশুটে লোম তেমনি ঝামরে পড়ছে ঘাড়ে। মৃগর সম্বর দলটায় বাচ্ছা বাড়ছে একে একে। লালসিংকে চিনে নিয়েছে মৃগ। সে যেন আজ তার দলেরই একটা অঙ্গ। যেখানেই যায় মৃগর দল, পেছনে দেখা যায় লালসিংকে; ব্যবধান শুধু বন্দুকের পাল্লার। কিছুতেই লালসিং মৃগকে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আনতে পারেনি। আর তাই তার জেদ ক্রমশ চড়ে গেছে।

* * * *

মৃগকে একবার শুধু বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পেয়েছিল লালসিং। সে এক সন্ধ্যা। মৃগর দলটার পেছনে নির্মমভাবে এগিয়ে চলেছে

লালসিং। সম্বরের দলটার যেন তাড়া নেই, অথচ ঠিক বন্দুকের পাল্লার বাইরে বাইরে উঠে চলেছে উঁচু থেকে উঁচু ওপরের পাহাড়ের মালভূমির দিকে। কোথাও চড়াই, কোথাও উৎরাই। হঠাৎ —ভৌ-ঔ-উ—ভো-উ!

লালসিং চমকে দেখে, ভয়ঙ্কর করগড়ির দল ওপর থেকে আক্রমণ শুরু করেছে!

ভো-ও-ভৌ! হরিণ, হরিণ! ছুটে চল ভাই, ছুটে চল! গোদা করগড়িটা হেঁকে বলে। মাটির ওপর মুখ-রাখা অনেকগুলো করগড়ির শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যায়।

মৃগ উত্তেজিত ভাঙা-ভাঙা চড়া গলায় সম্বরের সাবধানী ডাক ডেকে ওঠে। বিদ্যুৎগতিতে বাঁক নেয় সম্বরের দল, নামতে থাকে তারা যেদিকটা দিয়ে লালসিং মৃগর দলের পেছু নিয়েছিল। কাছে, কাছে, আরও কাছে! হরিণেরা ছুটেছে। লালসিং বন্দুকটা তুলে ধরে। আগে একটা হরিণী, পেছনে দল, সব শেষে উচ্চৈঃশ্রবা আর মৃগ।

ভো-ও-ও-ভো! সম্মিলিত করগড়ির ডাক বন থেকে বনে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

লালসিং যে পাহাড়টা দিয়ে উঠছিল তার পাশ দিয়ে উঠেছে আর-একটা পাহাড়। লালসিংএর কাছের জায়গাটা থেকে দুটো পাহাড়ে অনেকটা ব্যবধান, কিন্তু আরও উঁচুতে দুটো পাহাড়ের দুটো অংশ অনেকটা কাছাকাছি এসে গেছে, যেন পাহাড়দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে পরস্পরের দিকে অথচ ধরতে পারে নি। সেই দুই হাতের মাঝখান দিয়ে অতলস্পর্শী খাদ। সেই জায়গাটায় সম্বরের দলটা এসে পৌঁছবামাত্র আবার পেছন থেকে মৃগর গম্ভীর ডাক শোনা যায়। দলটা থমকে দাঁড়ায় এক মুহূর্ত, তারপর লাফের পর লাফে সেই খাদটা পার হয়ে যেতে থাকে হরিণের দল।

ও! পালাবে? কিন্তু জায়গাটা যে একেবারে বন্দুকের পাল্লার ভেতর। লালসিং উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে বন্দুকে তাক নেয়। এদিকে, একি? মৃগ খাদের ওপরে থমকে দাঁড়িয়েছে। মৃগ ডেকে ওঠে। দলের একটা বাচ্ছা পেছিয়ে পড়েছে।

হো হা করে হেসে ওঠে করগড়ির দল।

মৃগর দলের বাচ্ছাটাও এক লাফে পার হল খানা, কিন্তু গোদা করগড়িটাও লাফ মেরেছে তখন।

সেই সময় এক গুলিতে মৃগকে সাবাড় করে দিতে পারত লালসিং; কারণ একে তো পাল্লার ভেতর, তার ওপর মৃগ তখন দাঁড়িয়ে ছিল।

কিন্তু পারেনি লালসিং। সে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল আকাশের পটে আঁকা এই দলপতির প্রতি, দলকে বাঁচাতে যে নিজের প্রাণ দিতে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন। সে কী দাঁড়ানোর ভঙ্গী! দুটো

করে পা দুধারে ঈষৎ বিস্তৃত, মাথাটা সামান্য নিচু, কাঁধের পেশীগুলো ফুলে উঠেছে।

ভৌ-ঔ! একটা বিদ্যুৎ।

আর মাথার ওপর লুফে নিল মৃগ গোদা করগড়িটাকে এবং করগড়িটা দাঁত বসাবার আগেই সে কী প্রচণ্ড এক ঝটকা! একটা মৃত্যুময় আর্তনাদ। গোদা করগড়িটা তখন খাদের অতল তলে পড়ছে।

একটা বিজয় ডাক ডেকে উঠে চকিতে দেখে নিল মৃগ লালসিংকে, তার পরে বিদ্যুতের মত ঘুরে দলের উদ্দেশে মিলিয়ে গেল সে।

অবাক বিস্ময়ে লালসিং ভাবল, সম্বর-দলপতির সে দৃষ্টিতে কি ছিল কৃতজ্ঞতার আভাস?

করগড়ির দল তখন ছুটে নিচে নেমে চলেছে। হরিণেরা পালালো, মরা গোদা করগড়ির মাংসটা নষ্ট করে লাভ কী? করগড়িরা খাদ্য অপচয় করে না।

আট

আবার একটা গরম এসে গেল। অগ্নিবর্ষী তাম্রাভ আকাশ। বাদায় জল কমে আসছে, কাদার দ্বীপ দেখা দেয় মাঝে মাঝে।

প্যাঁক প্যাঁক, পেঁয়াক! ভোর না-হতেই ডাক দেয় রাঙামুড়ি সর্দার।

পিঁক পিঁক, পুঁক! বাচ্ছারা ধেয়ে আসে।

আকাশের দিকে চেয়ে রাঙামুড়ি সর্দার বলে, জানিস বাছারা, এই হল রাঙামুড়িদের যাত্রার সময়; দূর পাহাড়ের কোল ঘেঁসে, মেঘের মাথায় মাথায়, সাপের মত নদী রেখে পায়ের নিচে। সে এক অদ্ভুত আকাশে উড়ে চলা!

পাতি-হংসী ধেয়ে আসে, পেঁয়াক, পেঁয়াক! আবার শেখাচ্ছ ওদের ওড়ার কথা? খবরদার বলবে না বাজে কথা! পারো তুমি উড়তে? জিগেস কর্ তো বাচ্ছারা তোদের বাপ পারে কি না উড়তে?

সেই সময় মেঘের মাথায় বেজে ওঠে ক্ষীণ আওয়াজ—হঁক হঁক! হঁক হঁক!

রাঙামুড়ির দল? শেষে একটা যাযাবর দল চলেছে কি সেই তুষার-গলে-বার-হওয়া সাইবিরিয়ার সবুজ স্টেপিজ বনে? রাঙামুড়ি সর্দার চঞ্চল হয়ে ডানদুটো ঝাপটে ওঠে। আবার বুজিয়ে নেয় ডানা। কী দরকার? কেন ফেলে যাওয়া শান্ত নিরুপদ্রব এই জীবন,

এই বনের সমাহিত কোল? বনের এই ছোট্ট পৃথিবী তো তার, চিকিমিকি মাছের দল খেলা করে আজও জলে। তবু কেন রক্তে লাগে জোয়ার?

হুঁক হুঁক! হুঁক হুঁক!

হঠাৎ ডানা মেলে আকাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাঙামুড়ি সর্দার, আর তীব্র আনন্দে ডেকে ওঠে যাযাবর যাত্রাধ্বনি—হুঁক হুঁক! হুঁক হুঁক!

তারপর বিশ্রান্ত সবল ডানার ঝাপটায় ঝাপটায় মেঘের ওপর মিলিয়ে যেতে থাকে। উদ্দাম রক্তস্রোত,—অনাদি-কালের অভ্যাস ডাক দিয়েছে তাকে!

অবাক বিস্ময়ে আকাশের পানে তাকিয়ে থাকে পাতি-হংসী।

* * *

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ঘুরে ঘুরে আসে। খড়িয়াদের গ্রামটা বড় হতে থাকে। লালসিং ফিরে যায় সহরে, আবার ফিরে ফিরে আসে। পাগড়ির পাশ দিয়ে কয়েকটা চুলে তার দেখা যায় রুপোলি তার। মৃগকে সে আজও পারেনি বন্দুকের পাল্লার ভেতর আনতে, কিন্তু আশা সে ছাড়েনি আজও। আজও দেখা যায় একটা সম্বরের দলের পেছনে তাকে বনের পর বন, পাহাড়ের পর পাহাড় ভাঙতে। আর মৃগও অভ্যস্ত হয়ে গেছে লালসিংকে দেখতে। যেখানেই সে নিয়ে যায় দল, কিছু পরেই সে দেখতে পায় ওই দুপেয়ে মানুষটাকে। শুধু একটা অনুভূতির বলে সে যেন মেপে বুঝে নিয়েছে, ওই মানুষটা থেকে কতখানি দূরে থাকা নিরাপদ।

সেদিন ভোর না-হতেই খড়িয়াদের গাঁয়ে মহা হৈ চৈ—বাঘ, বাঘ! একটা ছাগল-ছানাকে বাঘে নিয়ে গেছে! খোঁয়াড়ের ধারে রক্ত আর বাঘের থাবার দাগ সুস্পষ্ট।

ডাক ডাক, সিংজীকে ডাক, বাঘ মারতে হবে! হতভাগা বাঘ একবার স্বাদ পেয়েছে পোষা জানোয়ারের—কে জানে কবে মানুষ মারবে?

কোথায় সিংজী ?

দুজন খড়িয়া বলে, সিংজী ভোলে গেছে।

যেসব জন্তু মাংস খায় না, ঘাস পাতা ফলমূল খেয়ে বেড়ে ওঠে, তাদের মাঝে-মাঝে নুন খাওয়ার বড় দরকার হয়। নুন না খেলে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে না। সম্বরেরা নুন খেতে খুব ভালবাসে। আর পাহাড়ি বনে উদার প্রকৃতি তার ব্যবস্থা করে রেখেছে। বনের ভেতর জায়গায় জায়গায় নোনা মাটি থাকে। সম্বরেরা এসে সেই নোনা মাটি চাটে। এইসব নোনা মাটির দেশী নাম হল ভোল। লালসিং বুনো খড়িয়াদের কাছে শুনেছিল যে বড় হরিণের দলটা এবার ভোলে গেছে। এমন সুযোগ ছেড়ে দিতে পারে লালসিং ?

যে ভোলটার ধারে মৃগ তার দলকে নিয়ে এসেছিল এবার, সেটা একটা পাহাড়ি নোনা উৎসের ধারে। নোনা মাটির ভেতর থেকে অল্প অল্প জল ওঠে, হরিণেরা চাটে সেই মাটি। মৃগকে আজ দেখা যায় যেন ঈষৎ ক্লান্ত, কাঁধের প্রশস্ত পেশীগুলো তার শিথিল হয়ে এসেছে। সোনালি লোমগুলোয় তার বার্ধক্যের কটা ছোপ। চোখের দৃষ্টি ঈষৎ নিষ্প্রভ, শুধু মাথাটায় আজও আছে সেই দলপতির উদ্ধত ভঙ্গী, আর একজোড়া বিশাল শিং।

ভোলের ধারে লালসিংএর অস্তিত্বও জানে মৃগ। সে আর উচ্চৈঃশ্রবা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছে ধীরে ধীরে লালসিংকে উঠে আসতে। ওই পাগড়ি-বাঁধা মাথাটা তার আজ বছরের পর বছর ধরে পরিচিত। ওকে আর ভয় করেনা মৃগ। ব্যবধানটা রাখতে পারলেই হল।

মানুষটা চালাক, কিন্তু সে দলপতি—তাকে ফাঁকি দেবে ? ওই দূর টিলাটা দেখা যায়, ওর আড়ালে মানুষটার পাগড়িটা দেখা যাচ্ছে; শুধু পাগড়িটা, মানুষটাকে দেখা না-গেলেই বা ! কিন্তু ওই টিলাটাই শেষ। ওর থেকে এগোলেই দলকে হাঁটতে হুকুম দেবে মৃগ।

আর লালসিংও জানত সে মৃগকে ফাঁকি দিতে পারেনি সে। ওই সম্বর দলপতি টের পেয়ে গেছে তার অস্তিত্ব। একবার টিলাটা ছেড়ে এগোতে গিয়েছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে বাতাস কাঁপিয়ে সেই ভাঙা-ভাঙা চড়া ডাক সম্বরের। সম্বরের দলটা ধীর পায়ে চলতে শুরু করে। তাড়াতাড়ি পেছিয়ে আসে লালসিং। টিলাটার নিচে বসে জিরোয়। পাহাড়ে উঠতে দম বেরিয়ে আসে আজকাল। বেজায় চালাক সম্বরের দলটা। লোভনীয় ভোল তারা ছেড়ে যেতে পারে না, আবার ফিরে আসে। যেন দুই যোদ্ধা আজ দূর থেকে পরস্পর পরস্পরকে বুঝে নিচ্ছে শেষ যুদ্ধের আগে।

টিলাটার নিচে বসে চুপ করে খানিকক্ষণ ভাবে লালসিং। ওই দূরে দেখা যায় তার লোভনীয় সেই হরিণের মাথা। একটা নয়, দু-দুটো। ওর সঙ্গীর শিং জোড়া দলপতির মত অত বড় না হলেও কম নয় এবং কম লোভনীয় নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বন্দুকের পাল্লার বাইরে। এক পা এগোলেই হরিণের দলটাও হাঁটতে শুরু করবে। আজ সে অন্তত ওই দলটাকে চোখছাড়া করতে চায় না। লালসিং ভাবতে শুরু করে। আচ্ছা, ওই ঈষৎ নিচু জায়গাটা থেকে হরিণের দলটা তাকে লক্ষ্য করছে কী করে? সে দেখল, যে টিলাটার পাথরের আড়ালে সে বসে ছিল সেই পাথরটা ঠিক তার মাথাটা ছাড়িয়ে গেছে কিন্তু তার পাগড়িটা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। তাহলে ওই দূর দলটার থেকে নিশ্চয় দেখা যাচ্ছে তার পাগড়ি। লালসিং-এর বুকে রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে ওঠে। টিলার পাথরটার ওপরে একেবারে এধারের দিকে সে খুলে রাখে পাগড়িটা, তারপর উপুড় হয়ে পড়ে বন্দুকটা বাগিয়ে নিঃশব্দে বুকে হাঁটতে শুরু করে দেয়।

* * *

সম্বরের দলটা তখন ভোলের মাটি চাটছে। আকাশের পটে আঁকা নিঃশব্দ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে ছিল মৃগ, চোখ তার সেই দূর

পাগড়িটার ওপর স্থির। কিন্তু আজ একি? মানুষটা তো এগোচ্ছে না! মনে মনে একটা অস্বস্তি অনুভব করে মৃগ। নাঃ কিছু না, ওই তো দেখা যায় পাগড়িটা। যতক্ষণ না ওটা এগোচ্ছে বা নড়ছে, ভয় নেই। এদিকে দলের তার প্রায় খাওয়া হয়ে এল। উচ্চৈঃশ্রবা এসে দাঁড়িয়েছে পাশে।

ওই দূর মাথাটার ওপর নজর রাখো, হুকুম দিল মৃগ, আমি ততক্ষণ খেয়ে নিই। ওই মাথাটা নড়লেই চলার হুকুম দেবে।

মৃগ সরে গিয়ে হাঁটু ভেঙে খাওয়ায় মন দেয়; আর হাঁটুটা ভেঙে বসেছিল বলেই তার দলপতি জীবনের একটা ভুলের দাম দিতে হয়নি তাকে।

* * *

শনৈঃ শনৈঃ বুকে হেঁটে এগোতে এগোতে লালসিং অনুভব করে, দিন তার চলে গেছে। প্রচণ্ড হাঁফ লাগে তার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কনকন করতে থাকে। আরও, আরও একটু; তাহলেই বন্দুকের পাল্লার ভেতর পাওয়া যাবে ওই দলটাকে। ওই তো! ওই তো আকাশের পটে আঁকা সেই মাথা! মাথা তুলতে পারে না লালসিং, ঘন ঘাসের ভেতর দিয়ে আবছা দেখে নেয় সে, তারপর সরীসৃপের মত একটু-একটু করে এগিয়ে চলে। এইবার, এইবার এসেছে সময়। কনুই-দুটোর ওপর ভর দিয়ে বন্দুকটা তুলে ধরে সে, টেলিস্কোপ-সাইটে চোখ দেয়, তারপরে টিপে দেয় ঘোড়া।

বাজনলা বন্দুকের প্রচণ্ড গর্জন! একটা আর্ত চিৎকার, তারপর কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যায় উচ্চৈঃশ্রবা। বিদ্যুতের মত লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে ডেকে ওঠে মৃগ। তার দল তখন ছত্রভঙ্গের মত ছুটেছে। মৃগও এঁকে-বেঁকে ছুটতে ছুটতে তাদের পেছু নেয়। একি? এ কী হল? দলপতি সে, সেও ভুল করেছে? ছুটতে ছুটতে হাঁফাতে থাকে মৃগ। দল তার ছটকে গেছে। কোথায়? কোন্‌দিকে?

একবার পেছন ফিরে তাকায় মৃগ। উচ্চৈঃশ্রবা আসছে? কই, না! এমনি ছুটে সে কতদিন কত শত্রুকে ফাঁকি দিয়েছে! সেসব দিনে তার পাশে-পাশে ছুটেছে উচ্চৈঃশ্রবা। কিন্তু আজ সে নেই। তার আজন্মের সাথী উচ্চৈঃশ্রবা আর কোনদিন ছুটবে না পাশাপাশি। ওদিকে তার দল এগিয়ে গেল। দলের নবীন হরিণদের পায়ে এখন বিদ্যুৎ, তাদের সে-ই শিখিয়েছে বনের নিয়ম, আজ তাদের সঙ্গে তাল রাখার ক্ষমতা নেই তার পায়ের পেশীতে, শরীর ভারী হয়ে গেছে।

সন্ধ্যার আকাশ আজও তেমনি উচ্ছৃঙ্খল, উজ্জ্বল লাল? না, পশ্চিমে লেগেছে রাঙা উদাসীনতা? নিচের বনে নামছে কালো আঁধার। জঙ্গলের লতাপাতা-ঢাকা একটা কোনে ঢুকে পড়ে মৃগ আর তারই ভেতর গা-ঢাকা দিয়ে হাঁফায়।

লালসিং তখন উচ্চৈঃশ্রবার শিঙাল মাথাটা নিয়ে নেমে চলেছে। সর্দারকে নামাতে পারেনি সে, কিন্তু আর নয়। তার দিন গেছে। থাক বনের জানোয়ার বনে। প্রাণস্রোতকে বাধা দেবার সে কে?

নয়

আর একদিন রাতে যখন খড়িয়াদের গাঁ থেকে একটা বাছুর বাঘের পেটে গেল, খড়িয়ারা তো ক্ষেপে গেলই, তার ওপর দেখা গেল, বাঘটার সাহস ক্রমশ বেড়ে চলেছে। রাতে চলেছিল হানা এতদিন; তারপর হল কী, একদিন ভোরবেলা একজন খড়িয়া সরষে-ক্ষেতের ধারে একটা নালায় বদনা হাতে প্রকৃতি-দত্ত একটা কাজ সারতে বসেছিল, হঠাৎ নালার লম্বা লম্বা ঘাসের ওধারে, মুখোমুখি—ও বাবা, ওটা কী! বদনা হাতে চাষার সে কী লাফ! বাঘটা বোধহয় ভেবেছিল তখন, দুপেয়ে জানোয়ারের এ আবার কী কাণ্ড রে বাবা! ল্যাজ তুলে বাঘটাও উল্টোমুখে ছুট লাগিয়েছিল বটে, কিন্তু দিনেই তো হানা। হু-উ-ম্ করে লাফিয়ে পড়লেই তো হল একদিন, তারপর নোনা রক্তের স্বাদ পেলে আর রক্ষে আছে?

এ আর কত সওয়া যায়? খড়িয়ারা লালসিংএর শরণাপন্ন হল।

দুপেয়ে মানুষগুলো তো আর জানেনা যে রাজা বুড়ো হয়ে গেছে, তাই এখন তার শিকার জোটা ভার। পুরোনো গাছের দলের বাকল গেছে শুকিয়ে, নতুন গাছের সরল রেখা মাথা তুলে উঠেছে আকাশে। ময়ূরকণ্ঠী বনে শরীরে পেশীর ঢেউ খেলিয়ে ঘুরে বেড়ায় নতুন বাঘেরা। হয়ত বা তারা বাচ্চা। কিন্তু রাজা এখন দুর্বল। দাঁতাল বুনো শুয়োরগুলোকে সে এখন ভয় করে, হরিণের দ্রুত গতির সঙ্গে আর পেরে ওঠে না। তাই তাকে প্রিয়, পরিচিত বন ছাড়তে

হল। পেটের দায়ে বনের ধারে দুপেয়ে জানোয়ারদের আড্ডার কাছে একটা নালায় আশ্রয় নিল রাজা। শক্তি চলে গেছে, ধূর্ততাই তখন সম্বল। প্রথমে একটা ছাগল, তারপর একটা বাছুর, পরে একদিন একটা দুপেয়ে মানুষকেই শিকার করে বসল সে। দুপেয়ে জানোয়ারগুলো শিকার করা কী সোজা, আর তাদের নোনা রক্তে কী অদ্ভুত স্বাদ!

খড়িয়াদের গাঁয়ে তখন মহা হৈ-চৈ! বাঘ! বাঘ! বদমাইস বাঘ, ধূর্ত, পাজি! সব মেরে ছারখার করে দিল! তারা তো জানেনা যে প্রবল-পরাক্রান্ত রাজাকে আজ বার্ধক্যে পড়েই হানা দিতে হয়েছে গাঁয়ে!

সেদিন নিশুতি রাত। আকাশে চাঁদ নেই, কিন্তু অসংখ্য হীরে-কুচি কে যেন উড়িয়ে দিয়েছে শূন্যে। জোনাকির মালা উড়ে চলেছে নিচে। সরষে ক্ষেতের ভেতর একটা ছাগলছানা অনবরত চিৎকার করে চলেছে। আর সেই ডাক অনুসরণ করে নালার ভেতর নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে চলেছে রাজা। ওই তো, ওই তো দেখা যায়! সহজ শিকার! আকাশের খণ্ডমেঘ ঢেকে ফেলে এক মুহূর্তে তারার দল। মেঘ উড়ে যায়, নিঃসঙ্গ পৃথিবীর ওপর কালো আকাশ জ্বলজ্বলিয়ে ওঠে। হঠাৎ অন্ধকার চিরে দিয়ে একটা তীব্র আলোর রশ্মি একটু দূরের একটা মাচার ওপর থেকে রাজার ওপর এসে পড়ে। সেই আলোয় দেখা যায়, সেই শেষবার তার পুরোনো শিকারের ভঙ্গীতে বসেছে রাজা। ঠোঁট গেছে গুটিয়ে, বড়-বড় দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে, কানদুটো পেছন দিকে চ্যাপ্টা হয়ে মাথার সঙ্গে লেপ্টে গেছে আর ল্যাজটা চাবুকের মত এপাশ-ওপাশ করে দুলছে।

চোখের ওপর আলোটা পড়ামাত্র নিজের বিপদ বুঝতে পারে রাজা। একটা হুঙ্কার করে মাচাটা লক্ষ্য করে লাফ মারে সে। সঙ্গে সঙ্গে বাজনলা বন্দুকের সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। আর্ত হুঙ্কার

করে আছড়ে পড়ে রাজা। সমস্ত শরীরটা তার যন্ত্রণায় কেঁপে-কেঁপে ওঠে, মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠতে থাকে। তারই মধ্যে তীব্র গর্জনে দিক ফাটিয়ে দৌড় লাগালো সে। সে জানত, একটা কোথাও দাঁড়ালেই, গতি কোথাও মন্থর করলেই, সেইখানেই তার শেষ।

শীতের শেষ। সুনীল আকাশ মেঘহীন, রিক্ত, নিঃস্ব। গাছে গাছে পাতা নেই। ধূসর পাঁশুটে গাছগুলো পত্রহীন ডালপালা আকাশে বাড়িয়ে দিয়ে যেন হা হা করছে। বার্ধক্য নেমেছে যেন ময়ূরকণ্ঠী বনে। অথচ কে বলবে, এই আগামী বসন্তেই এই রক্তপলাশের দল লালে লালে আগুন ধরিয়ে দেবে ময়ূরকণ্ঠী বনে? আজ শুধু আঁকাবাঁকা দীর্ঘ পলাশগুলোর এলোমেলো অমসৃণ ভঙ্গীতে পীড়িত ধূসর রঙের একঘেয়েমি চোখকে পীড়া দেয়।

ওই পলাশগুলোর রিক্ত ডালে ডালে ওই সময় আশ্রয় নেয় দলে দলে শকুন। গাছের রঙে মিশে-যাওয়া, ন্যাড়া, কুঁজো পাখিগুলোকে দূর থেকে দেখলে যেন মনে হয়, গাছগুলোর গায়ে অনেকগুলো কদাকার আব উঠেছে। কিন্তু ওদের কাছে এগিয়ে যাও, দেখতে পাবে,—তীক্ষ্ণ, ইস্পাতের মত শক্ত একটা বাঁকানো চঞ্চু, তার পর থেকে ন্যাড়া লাল চামড়ার গলার পেছনে হঠাৎ বড় বড় পালকে ঢাকা এক একটা বিশাল দেহ। রিক্ত গাছগুলোর মাথা থেকে গলা বাড়িয়ে তারা যখন দূর দিগন্ত পানে তাকিয়ে থাকে তখন তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে তুমি শিউরে উঠবে। সে চোখে যেন জ্যোতি নেই, অথচ আছে একটা অনাদি কালের অভিজ্ঞতা। সেই দীর্ঘ গাছগুলোর মাথা থেকে শকুনের দল শিথিল অথচ একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দিগন্ত পানে। কী দেখে? কী খোঁজে তারা?

এদিকে বন ঘন নয়, ছড়ানো, রুক্ষ, বালুময়। এদিকের বনে দেখা যায়, মাঝে-মাঝে পড়ে আছে শুকনো হাড়। হয়ত একটা পাঁজরের অংশ, হয়ত-বা একটা চুন-ওঠা কঙ্কাল। অথচ এদিকের পৃথিবী পরিষ্কার সূর্যতেজে তপ্ত, চাঁদের আলোয় থমথমে, রহস্যময়। এদিকের বনে বলদীপ্ত জীবন্ত প্রাণীকে বড়-একটা দেখা যায় না। হরিণেরা এড়িয়ে চলে এ বন। গয়াল মহিষের দল এ বনের জলায় আশ্রয় খোঁজে না ; বাঘ শিকারের পেছনে তাড়া করে এসে এ বনের সামনে থমকে দাঁড়ায়। এ বন যেন বনের সমাধি, বসন্তে রাঙা হয়, মরণেও জীবনের জয়গান জানায়।

•

অস্তসূর্যের শেষ আভায় জ্বলে উঠেছে পশ্চিম আকাশ। একটা সম্ভর হরিণ ক্লান্ত পায়ে এই বনের ভেতরে এসে ঢোকার আগে একবার পেছন ফিরে তাকালো। ওই দূরে, মেঘ-সুনীল আকাশের কোলে তার দল মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোতিহীন, নিস্প্রভ চোখে একবার পেছনের বনে দেখে নেয় হরিণটা। লেগেছে কি বনের মাথায় ময়ূরকণ্ঠী রং? আজ আর তার পায়ে নেই বিদ্যুতের গতি, যার বলে ওই বনের ভেতর দিয়ে তার দলকে নিয়ে কতবার সে বাঘের মুখ থেকে ছুটে চলে গেছে ; এড়িয়েছে করগড়ির দলকে। দলপতি সে, প্রায় জীবন দিয়ে বাঁচিয়েছে দলকে। করগড়ির থাবার দাগ আজও জ্বল জ্বল করছে কাঁধে।

কিন্তু আজ তার কাজ শেষ। আজ সে আর নবযৌবনদীপ্ত ক্ষিপ্র হরিণগুলোর সঙ্গে দৌড়োতে পারে না ; আজ আর তার দীপ্তি নেই. একটা শেষ অনুভূতি আজ তাকে নিয়ে এল এই বনে। একটা কুণ্ডীর ধারে বালির ওপর আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল সে। অন্ধকার নেমে আসছে। আর সেই আলো-আঁধারিতে সে দেখল, ঝুপ ঝুপ করে তাকে ঘিরে কয়েকটা বড়-বড় পাখি নেমে পড়ল। লাল

গলাগুলো তাদের ন্যাড়া, চঞ্চুগুলো বাঁকানো ইস্পাতের ফলা। চোখের দৃষ্টিতে তাদের জ্যোতি নেই, অথচ আছে একটা অনাদিকালের বন্য অভিজ্ঞতা। হরিণটা ভাঙা-ভাঙা কাঁপা গলায় সন্তরের শেষ ডাক ডেকে উঠল—সে ডাকে ছিল না ভয়, ছিল না চেষ্টা, যুদ্ধ ছিল না—ছিল শুধু আত্মসমর্পণ।

* * *

রাতের তারা যখন নিভু-নিভু, সেইসময় রক্তপলাশের বনে একটা জলার পাড়ে এসে শুয়ে পড়ল রাজা। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু আর জল খাওয়ারও শক্তি নেই। জিভ বেরিয়ে এসেছে, আর চোয়ালের দুপাশ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে আসছে। রাজা এলিয়ে দিল দেহ, আর ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ঘিরে নামল সেই কুব্জদেহ আদিম পাখির দল। একবার চোখ খুলে শকুনের দলকে দেখে ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠেছিল রাজা। শকুনের দল গোল হয়ে রাজাকে ঘিরে এগিয়ে আসছিল, থমকে দাঁড়িয়ে গেল তারা। কিছুক্ষণ বন্য স্তব্ধতা। তার পরে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোতে লাগল শকুনের দল। একটা গোদা শকুন প্রায় যখন রাজার ওপর গিয়ে পড়েছে, একটা থাবা সাঁ করে প্রায় শকুনটার ওপর দিয়ে ঘুরে গেল। অতবড় নড়বড়ে শরীরটায় অদ্ভুত ক্ষিপ্রগতিতে লাফিয়ে পেছিয়ে এল শকুনটা। চোখে তার ভয় নেই, জ্যোতি নেই—নিস্পৃহ, উদাস। সেই শেষ চেষ্টা রাজার। শরীরটা তার যখন কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে আসছে, তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল গৃধ্রের দল তার ওপর। শকুনেরা প্রকৃতির বন্য সংকার-সমিতি।

দশ

বুনো গাঁ ছেড়ে চলে এসেছে লালসিং সহরে, আর ফিরে যায়নি। উচ্চৈঃশ্রবার শিঙাল মাথাটা আজও তার দেওয়ালে টাঙানো আছে। তার কাঁচ-বাঁধানো চকচকে চোখে তাকিয়ে মনে হয় লালসিংএর যে হরিণটা যেন ব্যঙ্গ করছে তাকে। আর বন্দুক ধরেনি লালসিং। হাতে তার কাঁপন ধরেছে। শুধু কোনো কোনো বর্ষার রাতে ঘরে যখন তার আলো জ্বলে না আর বিদ্যুৎ ধাঁধিয়ে যায় ওই মরা হরিণটার সবুজ চোখে, তখন লালসিংএর চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যায়,—ময়ূরকণ্ঠী বনে ছুটে চলেছে হরিণের পাল। বাঘের গর্জনে গম্ গম্ করে উঠল বন। হাতীর পাল চলেছে সারে সারে, তালে তালে—অস্ত-আকাশের রাঙাপটে আঁকা। আর গয়ালের দল নেমেছে জলে। জললিলির সুবাসে বন ভরপুর। বন-ঝাউয়ের ছায়াগুলো সর্পিল এঁকে-বেঁকে যায় জলার জলে; ভোরের আলোয় বকের ঝাঁক যেন গাছের মাথায় মাথায় ফুটে-থাকা স্তবকে স্তবকে সাদা ফুল। বনটিয়ার ঝাঁক লতার ডগায় বসে দোলে; শালিক আর শ্যামার শিষে বসন্তের নেশা। পাতা থেকে পাতায় লাফিয়ে নেচে চলে বর্ষার মুক্তোমালা। চাঁদ ওঠে, চাঁদ কাঁপে,—শিশিরে ঢেউ-তোলা জলার ওপর। রুপোর নূপুর-পরা ঝর্ণা উপলে উপলে নেচে নেচে নামে, আর পরীর মত সুন্দরী মেয়েরা যেন সেই জলে

স্নান করতে নেমে চাঁদের আলোয় কালো চুল এলো করে দেয়। ভেসে আসে কমলার মধুর গন্ধ, মৌমাছির গুন-গুন। ভাল্লুক-মার গলা ভেসে আসে গমগম করে—যার চোখ আঁধারে জ্বলে, যার কানে ভেসে আসে দূর জানোয়ারের পায়ের শব্দ, যার নাকে বাতাস বয়ে আনে শত্রুর ঘ্রাণ, যার নখ পাথরে বাজে না, যার উরুতে থাকে বাতাসের বেগ, সে-ই শুধু বনে শিকারের যোগ্য।

বুড়ো লালসিং চোখ বুজিয়ে ঝিমোয়, ঘুমিয়ে পড়ে: চমকে জেগে ওঠে আবার, আবার ঝিমোতে থাকে।